ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

বিশেষ নির্বাচিত পাঠ - **৩১০**

DSE-310

Modern South East Asia

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।
-

Director’s Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners’ needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon’ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners’ end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon’ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded

directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

Discipline Specific elective (DSE) 01

(Students will opt for any one of the following two options)

DSE-301 (Option 01): Modern Southeast Asia

BLOCK 1: Decolonization in Southeast Asia and struggle for modernity

Unit- 1: Land and People

Unit- 2: Society & Culture

BLOCK 2: Thailand and the West.

Unit- 3: The process of modernization.

Unit- 4: Politics in early 20th century.

Unit- 5: Military dictatorship and democratic experiments in post-World War II Thailand.

BLOCK 3: Vietnam in the colonial period

Unit- 6: Colonial economy & society, Doumer and direct Rule 1897-1902

Unit-7: Post-Doumer developments–1902-1940, nationalism, colonialism and freedom struggle.

BLOCK 4: Vietnam in transition

Unit- 8: Non-communist to communist movement

Unit- 9: Ho-Chi-Minh- a critique of his leadership.

BLOCK 5: Colonial experience of Indonesia

Unit-10: The colonial experience

Unit- 11: Impact on land, people

Unit- 12: Indonesian society.

BLOCK 6: Rise of new Indonesia

Unit- 13: Cultural system

Unit- 14: Agricultural involution to agrarian evolution in colonial economy

Unit- 15: Rise of nationalism in Indonesia,

Unit- 16: *Sukarno*- a critique of the national hero.

পর্যায় - ১

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে থাইল্যান্ড

১৬.১.১.১ - সূচনা

১৬.১.১.২ - থাইল্যান্ড ও দঃ পূর্ব এশিয়ার অবস্থান, মানুষ ভাষা ও জীবনযাত্রা

১৬.১.২.৩ - চাক্রি রাজবংশের ইতিহাস

১৬.১.২.৪ - মংকুত ও চুলালংকর্ণের সংস্কার

১৬.১.২.৫ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১৬.১.১.১ - সূচনা

বর্তমান পর্যয়ে আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অবস্থান, মানুষজনের বিন্যাস ও তার সাথে থাইল্যান্ডের চাক্রি রাজবংশ সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি তারা যে সংস্কার করেছিলেন সেগুলিও জানব আমরা।

১৬.২.১.১ থাইল্যান্ড ও দঃ পূর্ব এশিয়ার অবস্থান, মানুষ ভাষা, ও জীবনযাত্রা

কর্কটক্রান্তি ও বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে সদ্য পরিচিত এই অঞ্চল চিন ও ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে। গোড়ার দিকে সমাজবিজ্ঞানীরা এর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি। কেউ কেউ এই অঞ্চলের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আবার অনেকে এই অঞ্চল থেকে ফিলিপিনসকে বাইরে রাখতে চেয়েছেন। বর্তমানে এর দুটি ভৌগোলিক অঞ্চল সুচিহ্নিত, একটি হল মহাদেশীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এর মধ্যে রয়েছে মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যান্ড (শ্যাম), ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া) ও লাওস। অন্যটি হল দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যার মধ্যে পড়ে ফিলিপিনস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া। ভারতীয় পণ্ডিতরা দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাম দিয়েছেন বৃহত্তর ভারত বা দ্বীপময় ভারত, অন্যদিকে চিনারা এর নামকরণ করেছে ‘ক্ষুদ্র চিন’। চিন ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত এই ভূভাগকে আবার অনেকে বলতে চান ইন্দো-চিন। বিখ্যাত ভূগোলবিদ জর্জ ক্রেসি প্রস্তাব করেছেন যে এই ভূভাগ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। দুই সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছে এই অঞ্চলে। এর নাম হওয়া উচিত ইন্দো-প্যাসিফিক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে একটি অখণ্ড ভৌগোলিক ভূভাগ হিসাবে গণ্য করা যায় না কারণ এর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। এখানে চারটি প্রধান ধর্মমতের অনুগামীদের দেখা যায়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী; মায়ানমার, লাওস, কাম্বেডিয়া ও থাইল্যান্ডের মানুষ থেরাবাদী বৌদ্ধধর্মের অনুগামী, এদের ওপর ভারতের প্রভাব বেশি। ভিয়েতনাম মহাযান মতবাদের অনুগামী, এ অঞ্চলের ওপর চিনের প্রভাব বেশি। ফিলিপিনসের বেশিরভাগ মানুষ হলেন ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ঐতিহাসিককালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কখনো চিন বা ভারতের মতো একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। পাঁচটি বহির্দেশীয় শক্তি এই অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—মায়ানমার, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ; ওলন্দাজ (ডাচ) শক্তি ইন্দোনেশিয়ায়; ফরাসিরা লাওস, কাম্বেডিয়া ও ভিয়েতনামে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিনসে। পর্তুগিজরা টিকে ছিল টিমর দ্বীপে। শুধু থাইল্যান্ড ছিল স্বাধীন। এসব বিদেশি শক্তির শাসন, শিক্ষা, বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, পরিবহন ছিল বিভিন্ন ধরনের। এজন্য এদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হল মনশুন এশিয়া (Monsoon Asin)। কর্কটক্রান্তির মধ্যে এর অবস্থান। ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু এই অঞ্চলে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, আঞ্চলিক ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, প্রচুর উদ্ভিদ জন্মে, আছে ঘন অরণ্য। ফিলিপিসন ও ইন্দোনেশিয়া কয়েক হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই দুই দেশে অনেক অঞ্চল অনুর্বর, আবার অনেক অঞ্চল বেশ উর্বর। ফিলিপিনসের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক গঠন একে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই অঞ্চলের আশপাশের সমুদ্র, দ্বীপ ও প্রণালী কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি পাহাড় ও পর্বত, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এইসব পর্বতশ্রেণির বেশির ভাগের উৎপত্তি তিব্বতে। অধ্যাপক ক্রেসি লিখেছেন যে, পূর্ব তিব্বত থেকে পর্বতশ্রেণি অক্টোপাসের মতো বহু বাহু বিস্তার করে পশ্চিমদিকে

অগ্রসর হয়েছে (Eastern Tibet as a complex knot or core area from which great mountain ranges radiate like the arms of an Octopus) । এই পর্বতশ্রেণি এশীয় জনগণকে বিভক্ত করেছে, আরাকান পর্বতশ্রেণি হল ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে বিভাজন রেখা। দাওনা, বিলাকটাঙ ও টেনাসেরিম মায়ানমারকে থাইল্যান্ড থেকে পৃথক করেছে। এই পর্বতশ্রেণি মালয় পর্যন্ত প্রসারিত। আনাম পর্বতশ্রেণি লাওস ও ভিয়েতনামকে পৃথক করেছে, ভিয়েতনামকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এক গুচ্ছ পর্বতশ্রেণি নৃশান, কাওলিকুংসান, উলিয়াং শান ও আইলাওশান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চিন থেকে পৃথক করে রেখেছে।

এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। এগুলি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনে বিশেষ সহায়ক নয়। নদী উপত্যকাগুলিতে প্রাচীনকাল থেকে জনবসতি গড়ে উঠেছে, তবে এগুলির মধ্যে শত শত কিমি দূরত্ব রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান প্রধান নদীগুলি হল ইরাবতী, চিন্দউয়িন ও সালউয়িন যারা মায়ানমারকে জল জোগায়। থাইল্যান্ডের প্রধান নদী হল চাওফ্রায়া, ভিয়েতনামের দুই প্রধান নদী হল সংকোই (লাল নদী) ও সংবো (কালো নদী)। এই দুটি নদী উত্তর ভিয়েতনামে। এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক নদী হল মেকং ও লাওস, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শত শত কিমি ধরে প্রবাহিত এই নদী পলিমাটি বহন করে নিয়ে আসে। বদ্বীপ অঞ্চলে তা জমা হয়। এগুলি ভারত মহাসাগরের প্রবেশ মুখে অবস্থিত। চারটি সমৃদ্ধ বদ্বীপ অঞ্চল হল—নিম্ন মায়ানমার, মধ্য থাইল্যান্ড, টংকিং এবং মেকং বদ্বীপ অঞ্চল। এসব অঞ্চল খুবই জনবহুল তবে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সব নদীর উত্তরদিকে রয়েছে নানা অবরোধ, প্রতিবন্ধক, এজন্য যাতায়াত ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য সহায়ক নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূপ্রকৃতি, বহু পাহাড় ও পর্বতমালা, নদী ও নানা প্রতিবন্ধক এই অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ও উন্নতির পথে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি ঐক্যবোধ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। গড়ে এই সময়ে ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই সময় প্রবল বাতাস বইতে থাকে, এর প্রভাবে ঝড় ওঠে, হারিকেন ও টাইফুন দেখা দেয়। এর ফলে নৌকা শুধু বাতাসের অনুকূলে চালানো সম্ভব হয়, কখনো বিপরীত দিকে নয়। নৌকাগুলিকে অনেক সময় তিন থেকে চার মাস অনুকূল বাতাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল হল সাধারণভাবে ধান উৎপাদন অঞ্চল। এই অঞ্চলে শুকনো ও জলাভূমিতে ধানের চাষ হয়, ধান হল এখানকার মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। পণ্ডিতদের অনুমান খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ নাগাদ পূর্ব ভারত, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে প্রথম ধানের চাষ হয়। তবে এও সম্ভব যে এই অঞ্চলের মানুষ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের আগে জলা জমিতে ধানের চাষ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। খ্রিস্টান শতকের গোড়ার দিকে এই প্রযুক্তি তারা আয়ত্ত করেছিল। উল্লেখ্য এ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুর আগমন অনেকটা প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এজন্য গোড়া থেকে এখানকার অধিবাসীরা জলসেচ ব্যবস্থার ওপর

নির্ভর করে ধান চাষের ব্যবস্থা করেছিল। গ্রামপ্রধান এই প্রযুক্তির প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য স্থাপন করেছিল। মৌসুমি বষ্টিপাতের খামখেয়ালিপনার জন্য এখানকার কৃষকরা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে আস্থা স্থাপন করেছিল, এসব শক্তিকে সন্তুষ্ট করে তারা বৃষ্টিপাত ঘটানোর কথা ভেবেছিল। আবার শস্য রোপণ, শস্য চাষ এবং শস্য সংগ্রহের জন্য তারা সূর্যালোকের জন্য প্রার্থনা জানাত। মৌসুমি বায়ু বাহিত প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানকার মানুষ উঁচু জায়গায় বাড়ি ও মন্দির বানাত, বাড়ির ছাদ ঢালু রাখা হত, জলনিকাশি ও জলসেচের ব্যবস্থা করা হত। মৌসুমি বায়ু এখুকার জনজীবনের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, ধর্মবিশ্বাস, বাণিজ্যিক কাজকর্ম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এর দ্বারা ছিল প্রভাবিত। যুগ-যুগান্ত ধরে এই ব্যবস্থা চলেছিল।

তিব্বত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদীগুলির উৎস। দক্ষিণ চিন ও পূর্ব তিব্বত হল জনগোষ্ঠীর আদি উৎস। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তরে রয়েছে চিনের বিশাল ভূখণ্ড। চিনের প্রধান জাতি গোষ্ঠী হল হান। এই হান জাতির লোকেরা ইয়াংসি পেরিয়ে অগ্রসর হলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে, পাহাড় পেরিয়ে এরা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় এসে হাজির হয়। দু'হাজার বছর ধরে এই অভিপ্রয়াণ চলেছিল। খ্রিস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দে হান জাতি চিনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে গোড়ার দিকে এই অভিপ্রয়াণ ছিল খুবই সীমিত, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে এই গতিবেগ দ্রুততর হয়েছিল। এই পূর্বে মায়ানমার, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের পূর্বপুরুষরা এসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কারণ হল চিন এসব আদিম মানুষের ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ দিয়েছিল। নদী উপত্যকা ও উর্বর সমতল ভূমিকে তারা বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে। এরা মনুষ্য উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

উল্লেখ্য চিন থেকে অধিবাসীরা একেবারে জনশূন্য অঞ্চলে আসেনি। সাম্প্রতিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন প্রমাণ করেছে মায়ানমারে পৃথিবীর আদিম মানুষের বাসস্থান ছিল। জাভাকে পৃথিবীর আদিম মানুষের অন্যতম বাসস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সোলো নদী উপত্যকায় প্রাচীন-মানুষের (হোমিনিড) নিদর্শন পাওয়া গেছে এর নাম হল জাভা মানুষ, নৃতত্ত্ববিদরা এর এইরকম নামকরণ করেছেন। এই মনুষ্য নিদর্শনকে পিকিং মানুষের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাদের আবির্ভাব কাল হল পাঁচ লক্ষ বছর আগে। এই অঞ্চলে আদিম মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে যেগুলি পরীক্ষা করে আদিম মানুষের আবির্ভাকাল নির্ণয় করা হয়। এই আদিম মানবগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছে সোলো ম্যান বা ওজাক ম্যান যারা হল পুরোনো প্রস্তর যুগের অধিবাসী। প্রায় বারো হাজার বছর আগে এই আদিম মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাবকাল ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এদের বংশধররা অস্ট্রেলয়েড -ভদোয়েদরা অস্ট্রেলিয়ায় বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। অস্ট্রেলিয়াবাসী এসব আদি মানুষ প্রস্তর যুগেই ছিল। মালয়ের সাকাই, দক্ষিণ সেলেবিস, এনগানো ও মেনতাবাই দ্বীপের অধিবাসীরা জাতিগতভাবে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। এরা সব সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী। ঐতিহাসিক সময়কালের আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরো দুটি মানবগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—নেগ্রিটো ও মেলানেশীয়। কেদা ও পেরাকের সেমাং উপজাতির লোকেরা হল নেগ্রিটোদের উত্তরপুরুষ। কেলানতনের পাঙ্গান ও

ফিলিপিনসের ইটারা এই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মেলানেশীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বসবাস করত, পরবর্তীকালে তারা এখান থেকে প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষজন, জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে নিশ্চিতভবে কিছু বলা যায় না, আদিম মানুষের কেন অবনতি ঘটল বা তাদের অবসান ঘটল সঠিকভাবে জানা যায়নি। এসব অঞ্চলে যেসব মানুষজন বিদেশ থেকে এসেছিল তাদের সঙ্গে স্থানীয় আদিম মানুষের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছিল সেটা খানিকটা অনিশ্চিত হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন জাতির মানুষ মিশে গিয়েছে, সাংস্কৃতিক মিশ্রণও ঘটেছে। আদিম মানুষ ক্রমশ পিছু হটে গিয়েছে, অনুর্বর উপত্যকা অঞ্চলে এদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু নিম্ন অববাহিকার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।। বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসংখ্যার এক শতাংশের কম এইসব আদিম জনগোষ্ঠীর বংশধর। বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বেশিরভাগ মানুষ মালয় গোষ্ঠীর, এদের গাত্রবর্ণ পীত রঙের, এরা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিনসে বসবাস করে। সব গবেষক মনে করেন এসব মালয়ীদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ চিন থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল, বিভিন্ন সময়ে এদের অভিবাসন চলেছিল দক্ষিণ দিকে। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ অর্ধ-মালয় মনুষ্য যাদের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ ছিল স্পষ্ট, তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে আসে। এরা তাদের সঙ্গে এনেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি। এদের পরে এসেছিল দিউতেরো মালয় গোষ্ঠীর লোক, আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে, এরা সম্ভবত এই অঞ্চলে ব্রোঞ্জ ও লোহার ব্যবহার শুরু করেছিল। এই দিউতেরো মালয় (Deutero-Malay) জাতির পূর্বপুরুষরা উপকূল অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল, অর্ধ-মালয়ের লোকজন দেশের অভ্যন্তরে সরে যেতে থাকে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া চলাকালীন তারা তাদের সাংস্কৃতিক সত্তা হারিয়ে ফেলে। সুমাত্রার বাটাক, বোর্নিওক ড্যাক, সেলেবিস ও মলুক্কাসের আদিম পূর্বপুরুষরা ছিল এরকম মানুষ। দিউতেরো মালয় জাতির লোকেরা দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা হল এক সাধারণ সংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুই প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর হল অস্ট্রো-এশিয়াটিক অর্থাৎ এশিয়া ভূখণ্ড্রে অস্ট্রিক শাখা এবং অস্ট্রোনেসিয়ান বা দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রিক শাখা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মোন, খেমর, মোই, বাননার, স্তিয়েং, চাম, সাকাই, সেমাঙ, পালঙ, ওয়া, রিয়াঙ ইত্যাদি। দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রিক শাখার ভাষা। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বালি প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা হল অস্ট্রোনেশিয়ান। মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া ভাষাও প্রচলিত। এখানে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা আড়াইশোর বেশি।

মায়ানমারে আদিম মানবগোষ্ঠীর অভিবাসন চলেছিল বহুকাল ধরে। তিব্বত ও দক্ষিণ চিন থেকে বহু লোক এখানে গিয়ে বসতি গড়ে তুলেছিল। এরকম এক ডজন উপজাতির মানুষ মায়ানমারে যায় তবে এদের মধ্যে অন্তত ছটির নাম উল্লেখ্য কারণ তারা সংখ্যা ছিল খুব বেশি এবং এদের ঐতিহাসিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এই সব উপজাতি গোষ্ঠী হল মোন, শান, কারেন, চিন, কাচিন ও বর্মন। বর্মন থেকে বর্মা নামের উৎপত্তি, এদের সংখ্যা খুব বেশি, মায়ানমারের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ হল বর্মন। নিম্ন মায়ানমার অঞ্চলে, শহরগুলিতে এবং সরকারি কাজকর্মে এদের প্রাধান্য লভ্য করা যায়। মায়ানমারের সংখ্যালঘু মানুষজনকে আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে পৃথক করা কঠিন। তবে এদের জীবনযাত্রায় লক্ষণীয় পার্থক্য

রয়েছে, এজন্য এদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটেছে। মোনরা ছাড়া আর সকলে সীমান্ত অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। এদের নামানুযায়ী এসব অঞ্চলের নামকরণ, ব্রিটিশ সরকার এসব উপজাতি অধ্যুশিত অঞ্চলের শাসনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেছিল। স্বাধীন মায়ানমার সরকার এই উপজাতিগুলিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস চালিয়েছে কিন্তু আজও সাফল্য অধরা রয়ে গেছে।

পণ্ডিতরা এবিষয়ে একমত নন মায়ানমারে অভিবাসন কীভাবে হয়েছিল, কত বছর ধরে চলেছিল। খ্রিস্টীয় শতকের গোড়ার দিকে বা তারও আগে থেকে চিন থেকে বা উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মোন উপজাতির লোকেরা এখানে এসেছিল। পূর্ব তিব্বত থেকে এসেছিল কারেন উপজাতির লোকেরা। উত্তর মায়ানমারের উর্বর সমতল ভূমিতে কিছুকাল কাটানোর পর মোন উপজাতি দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়, অধিকার করে নেয় নিম্ন মায়ানমার অঞ্চল এবং থাইল্যান্ডের সালউয়িন নদী উপত্যাকা। কারেন উপজাতির লোকেরা দুই মোন অধ্যুষিত পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থলে বসতি গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চিন উপজাতির লোকেরা পশ্চিম মায়ানমার অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। এরা নদী উপত্যকা অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে বর্মন উপজাতির লোকেরা বাধা দিয়েছিল। এই বর্মন উপজাতির লোকেরা পূর্ব তিব্বত ও চিনের উনান থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেরিয়ে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, দুশো বছর পরে উনান থেকে থাই উপজাতির লোকেরা অভিবাসন শুরু করেছিল। এরা মায়ানমারের পূর্বদিকের পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়। এখানে এই থাই উপজাতির লোকেরা শান নামে পরিচিতি লাভ করে। কাচিন উপজাতির লোকেরা উত্তর মায়ানমার অঞ্চলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এখানকার পাহাড়ি অঞ্চল কাচিন প্রদেশ নামে পরিচিত।

মোনদের সঙ্গে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি প্রধান উপজাতি হল খমের। এদের আদি বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এই খমের উপজাতির লোকেরা তাদের আত্মীয় মোনদের নিয়ে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ অভিবাসন শুরু করেছিল, সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম চিন অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি পর্বতমালা থেকে। মোন উপজাতির লোকেরা সালউয়িন নদী উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়ে নিম্ন মায়ানমার অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, পরে এরা মধ্য থাইল্যান্ড অঞ্চলে গিয়েছিল। খমের উপজাতির লোকেরা মেকং নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে কাম্বোডিয়ায় প্রবেশ করেছিল। এখানে মালয় উপজাতির লোকেদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ঘটে, মালয় উপজাতির লোকেরা এদের চাপে উচ্চ পাহাড়ি এলাকায় সরে যেতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের উপকূল বরাবর খমের উপজাতির সম্প্রসারণ ঘটে, এদের বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় বর্তমান কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে। বর্তমানে কাম্বোডিয়ার জনগণের ৮৫ শতাংশ হল খমের উপজাতির লোক।

এশিয়ার অনেক উপজাতি নামের সঙ্গে তাই বা থাই শব্দটি যুক্ত আছে। এদের সংখ্যা ৪০ মিলিয়ন। বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বিভিন্ন নাম, লাওস ও উত্তর থাইল্যান্ডে এরা লাও, উত্তর-পূর্ব মায়ানমারে এরা শান, দক্ষিণ চিনে এরা উনান থাই। উত্তর ভিয়েতনামে এদের উপজাতি থাই, থাইল্যান্ডে এরা শুধু থাই। থাইল্যান্ডে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। ২৮ মিলিয়ন। দক্ষিণ চিন থেকে অভিবাসন শুরু করে এরা দক্ষিণ

দিকে চলতে থাকে, এরা ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত থাই অভিবাসন প্রক্রিয়া চলেছিল। অনেক সময় ধরে তারা পূর্ব মায়ানমার, উত্তর থাইল্যান্ড ও উত্তর লাওসের বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চল অধিকার করে বসতি বিস্তার করেছিল। সালউয়িন নদী উপত্যকা থেকে তারা মায়ানমারের শান অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। থাইল্যান্ডের মেপিং ও চাও ফ্রায়া অববাহিকা ও লাওসের মেকং নদী বরাবর অগ্রসর হয়। যেসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ চিন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যে থাই ও ভিয়েতনামিরা চিনা সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

ভিয়েতনামিদের সম্পর্কে বলা হয় তারা তিব্বত থেকে অভিপ্রয়াণ করেছিল। বর্তমানে গবেষকরা মনে করেন ভিয়েতনামের অধিবাসীদের মধ্যে বহু রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে, এদের মধ্যে মোঙ্গলীয় ও অমোঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠীর রক্ত রয়েছে। এসব তত্ত্ব অনুযায়ী একটি অস্ট্রো-ইন্দোনেশিয়ান উপজাতি চিনের কোয়াংটুং ও কোয়াংসি অঞ্চলে মিশে যায়। ভিয়েতনামিরা লাল নদীর (Red river) বদ্বীপ অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। সময়কাল হল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মোঙ্গলীয় উপজাতির লোক থাইরা টংকিং আক্রমণ করলে এদের সঙ্গে ভিয়েতনামিদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ভিয়েতনামিদের মিশ্র জাতিতত্ত্বের প্রমাণ হল তাদের ভাষায় ইন্দোনেশিয়ান ও মোঙ্গলীয় উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এদের চিন্তা-ভাবনা ও ধর্মবিশ্বাসে সর্বপ্রাণবাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির সব উপদানে তারা অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব লক্ষ করেছে। সব অস্ট্রো-ইন্দোনেশিয়ান উপজাতির মধ্যে এসব লক্ষণ রয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরো দুটি গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এরা হল ভারতীয় ও চিনা। প্রত্যেক দেশেই অল্পসংখ্যক ভারতীয়রা বাস করে, বিশেষত মায়ানমার ও মালয়ে। এই দেশ দুটি একসময় ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। এদের বেশিরভাগ উনিশ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল রাবার বাগিচার শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, বন্দর ও সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। দক্ষিণ ভারত থেকে অনেকে গিয়েছিল বণিক ও মহাজন হিসেবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের সংখ্যা ২ মিলিয়ন, চিনাদের ১৪ মিলিয়ন। সব দেশে চিনারা আছে, সিঙ্গাপুরে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে চিনারা এই অঞ্চলে অভিবাসন শুরু করেছির, প্রথমে ভিয়েতনামে পরে অন্যান্য অঞ্চলে। সপ্তদশ শতকে চিনাদের অভিবাসন দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল, উনিশ শতকে তা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। চিনের উপকূল থেকে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় চিনারা এসেছিল, দেশে এদের পরিচয় ছিল বিদেশে বসবাসকারী চিনা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে, উত্থান-পতন সত্ত্বেও বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চিনারা অর্থনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলির সমীক্ষা করলে দেখা যায় বহু জাতি গোষ্ঠীর লোক এখানকার জনসংখ্যায় মিশে গেছে। বর্মন, খমের, ইন্দোনেশিয়ান, লাও, ফিলিপিনো, থাই, ভিয়েতনামি, মালয়, কারেন, সান, মোন, কাচিন, চাম, জল বা স্থলের ডায়ক, মেলানস, পাহাড়ি উপজাতি, ভারতীয় ও চিনারা হল এই অঞ্চলের প্রধান জাতিগোষ্ঠী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম মানুষের সভ্যতার রূপরেখাটি তৈরি করেছেন ঐতিহাসিক জর্জ সেডেস (Coedes)। এখানকার আদি মানুষজন জলসেচ করে ধান উৎপাদন করতে শিখেছিল। এরা ষাঁড় ও মহিষকে পোষ মানিয়ে ব্যবহার করতে শিখেছিল। কিছু কিছু ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল, তবে প্রযুক্তি ছিল

নিম্নমানের। এরা নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল কারণ চতুর্দিকে ছিল অসংখ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ ও সমুদ্র। পারিবারিক জীবনে এখানকার মানুষ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, পরিবারে মহিলারা ছিলেন সম্মানের আসনে। মায়ের দিকে থেকে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত। কৃষি ক্ষেত্র, জলসেচ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য এক ধরনের সংগঠন তৈরি হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাকালে দেখা যায় তারা পূর্বপুরুষ পূজা করত, সর্বপ্রাণবাদে (Animism) আস্থা রেখেছিল, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে পূজা করত। উচ্চস্থানে দেবালয় স্থাপন করে পূজা করা হত। মৃতদেহ জারে রেখে বা পাথরের মধ্যে স্থাপন করে সমাধিস্থ করা হত। তাদের বিশ্ববীক্ষায় ছিল দ্বৈতের ধারণা—পাহাড়-সমুদ্র, পাখাওয়ালা প্রাণী ও জলজ প্রাণী, পাহাড়ি মানুষ ও সমুদ্র উপকূলের মানুষ। এসব দ্বৈতভাব নিয়ে তাদের লোককাহিনি তৈরি হয়। এদের ভাষাগুলি সাক্ষ্য দেয় এদের অসম্ভব আত্তীকরণ ক্ষমতার। এই সংস্কৃতির মানুষজন বেশিরভাগ নদী উপত্যকা বা সমুদ্র উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল। পাহাড়ে ও দেশের অভ্যন্তরে অনেক মানুষ ছিল খুবই অনগ্রসর। অধ্যাপক ক্রোম (Krom) এই তালিকার সঙ্গে আরো তিনটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন—ওয়েয়াং বা পুতুলের ছায়া নাটক, গ্যামেলান অর্কেস্ট্রা এবং বুটিকের কাজ। চিনারা এর নাম দিয়েছে কু-লুন । পিটার স্মিট মনে করেন এখানকার সব মানুষ অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশিয়ান নামে দু'ভাগে বিভক্ত কিন্তু এদের মৌল প্রকৃতি একই রকম রয়ে গেছে।

১৬-১.২.৩ —চাক্রি রাজবংশের ইতিহাস

উনিশ শতকের সূচনায় থাইল্যান্ড ছিল একটি রক্ষণশীল ঐতিহ্য নির্ভর দেশ, ইউরোপীয়দের বিরোধী। সপ্তদশ শতকের শেষে রাজা নারাই বিপজ্জনকভাবে ইংরেজ ও ফরাসি অভিযাত্রীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মায়ানমার বহুকাল ধরে দেশটিতে লুটপাট চালিয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য চিনারা নিয়ন্ত্রণ করত। ব্রিটিশ শক্তি বর্মা ও মালয়ের সীমান্ত ধরে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ থাইল্যান্ডের সীমান্তে এসে হাজির হয়। এদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা হয়েছিল। তৃতীয় রামের শাসনকালে থাইল্যান্ড বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেখায়নি, সমর্থনও ছিল না। তিনি রক্ষণশীল মানব ছিলেন, ঐতিহ্যবাহী রক্ষা করে বাণিজ্যিক একচেটিয়া ব্যবস্থা ও সামন্তদের কাছ থেকে কর আদায় করে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি উদীয়মান সম্প্রসারণবাদী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সমঝোতা চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল এর স্বাভাবিক পরিণতি হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অবসান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছিল। থাইল্যান্ড তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও শাসনের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। এর একটি কারণ হল রাজা মংকুত (১৮৫১-১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) নতুন রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন করেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন মঠের সন্ন্যাসী, সেখানে তিনি পশ্চিম বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য পাঠ করেন। তিনি ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন, এই ভাষার মাধ্যমে তিনি পশ্চিমি শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হন। মার্কিন ও ব্রিটিশ মিশনারিরা তাকে এসব ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রাজা হবার পর তিনি পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেন। প্রথম চুক্তি হয় ইংল্যান্ডের সঙ্গে। থাইল্যান্ড এজন্য কিছু আইনগত ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু থাইল্যান্ড এই নীতি

অনুসরণ করে উদীয়মান পশ্চিমি শক্তিগুলিকে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তিনি প্রশাসনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমিদের সহায়তা নেন। এই পথে বড়ো বাধা ছিল ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীলতা। রাজার নিজের কিছু খামখেয়ালিপনা ছিল, মংকুত থাইল্যান্ডকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে যান, এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর পুত্র চুলালংকর্ণ। থাইল্যান্ডের প্রাচীন নাম সিয়াম বা শ্যামদেশ (Siam)।

থাইল্যান্ডের চাক্রি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রাজা প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি আংশিক চিনা। পিয়া থাকসিনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং অন্য আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। দেশবাসী বিপুলভাবে তাকে সমর্থন জানিয়েছিল কারণ পূর্ববর্তী শাসক ছিলেন উন্মাদ। তাঁর প্রথম কাজ ছিল দেশের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করা কারণ বর্মার তৎকালীন রাজা বোদপায়া এই দেশের ওপর সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। পরে এই আক্রমণ সীমান্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। চিয়েংমাই, নৌবহর ও যোজক অঞ্চলে আঘাত হানা হত। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের পর থাইল্যান্ড মারগুই ও তাভয় থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল তবে লিগরের সামন্ত শাসকের সাহায্য নিয়ে রাজা যোজকের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন, নিম্ন উপদ্বীপ অঞ্চলে থাইল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব বজায় ছিল। বর্মা থেকে সর্বদা আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় প্রথম রাম কাম্বোডিয়ার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাননি। এখানে তখন টে-সন বিদ্রোহী নগুয়েন আনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলেছিল। এর সুযোগ নিয়ে প্রথম রাম ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে কাম্বোডিয়ার রাজা আন ইংকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। ইনি টে-সন বিদ্রোহীদের ভয়ে ব্যাংককে আশ্রয় নেন। সাহায্য দেবার বিনিময়ে থাইল্যান্ড কাম্বোডিয়ার কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় রাম (১৮০৯-১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ) উগ্র আগ্রাসী রাজা ছিলেন না। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ভিয়েতনামের সম্রাট জিয়ালং নমপেনে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করলে দ্বিতীয় রাম কূটনীতির আশ্রয় নেন, কারণ এই সময় বর্মাও থাইল্যান্ড আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। তিনি কোরাট ও মেকং নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বামতীরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের পর বর্মা ভারতকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ১৮২৪-২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়, থাইল্যান্ড বর্মার আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। দ্বিতীয় রামের শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হল ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেদার সুলতানকে পদচ্যুত করেন। তার বিরুদ্ধে থাইল্যান্ডের দুটি অভিযোগ ছিল—তিনি বর্মিদের সঙ্গে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং পেনাং ও ওয়েলেসলি প্রদেশ ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দেন। তবে চাক্রি শাসকের ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। অল্পকাল পরে তারা বর্মা গ্রাস করে নেয়। থাইল্যান্ড অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবল ছিল কিন্তু আতঙ্ক ছিল। ১৮২৪-১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের শাসক ছিলেন তৃতীয় রাম। প্রথম দুইজন চাক্রি রাজা বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা দেখান। নারাই-এর দুঃখজনক অভিজ্ঞতাকে মনে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও কয়েকটি সুযোগ বিদেশিদের দেওয়া হয় পর্তুগিজ বণিককে শাহবন্দর হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন হান্টার নামে এক ব্রিটিশ বণিককে দেখে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাংকক ব্রিটিশ মিশনের প্রধান জন

ক্রুফোর্ডের সঙ্গে থাইল্যান্ড আলোচনা চালিয়েছিল কিন্তু কোনো চুক্তি করেনি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বার্ণি মিশনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল। পরের দশকে ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু চুক্তি হয়েছিল ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। থাইল্যান্ড স্বেচ্ছায় তার নিঃসঙ্গতা ত্যাগ করে পশ্চিমের সঙ্গে চুক্তি করেছিল।

থাইল্যান্ডের চাক্রি রাজবংশের শাসনের ভিত্তি ছিল প্রাচীন আঙ্করের প্রতিষ্ঠাগুলি বর্মার শাসনের সঙ্গেও এর অনেক মিল দেখা যায়। রাজা হলে নবরূপে দেবতা, চক্রকর্মী বা বিশ্বজনীন সম্রাট। তিনি বৃদ্ধ বা বোধিসত্ব। প্রাসাদের সবচেয়ে পবিত্র অংশে রাজা থাকতেন। রাজসভার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সব অনুষ্ঠান ও অলৌকিক কাজের ব্যবস্থা করত। তবে সরকারের প্রশাসনের ওপর এদের প্রভাব ছিল না। রাজার দেহ পবিত্র, তার শাসন নিরঙ্কুশ। দেশের সব জমি ও সব প্রজার তিনি হলেন মালিক, সব প্রজা কার্যত তার দাস। তিনি যেহেতু সবকিছুর মালিক তিনি কর ও সেবার আইনত অধিকারী। এই দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের ধারণার পেছনে ছিল প্রাচীন প্রথা। রাজা জনগণের প্রজা, সুশাসনের দায়িত্ব তার। ঊনিশ শতকের শেষদিকে এই ধারণা প্রচার লাভ করে। রাজার নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারের ওপর কোনো বিধিনিষেধ বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতীক হলেন রাজা, তিনি আইনের স্রষ্টা, তিনি নীতি নির্ধারক, তিনি সব উচ্চপদে নিয়োগকারী, আবার সামাজিক উচ্চ-নীচ নির্ধারণের দায়িত্ব তার। রাষ্ট্রের আয় ও রাজার ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, সংস্কৃতির উন্নতি সবকিছু রাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলসেচ, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি রাজার আয় বাড়াত, আবার জনগণের মঙ্গল হত।

রাজার মন্ত্রীসভার নাম ছিল সেনাবদি, ছটি প্রধান সরকারি বিভাগের প্রধানরা এই সদস্য হতেন। তিনটি প্রধান বিভাগ ছিল উত্তর, দক্ষিণ, বাণিজ্য ও বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক। উত্তর বিভাগ বর্মার আক্রমণ নিয়ে ব্যস্ত থাকত, দক্ষিণ বিভাগ মালয় সীমানা রক্ষার দিকে নজর দিত। এই তিনজন অফিসার সামরিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগ করত। এসব আধিকারিক বংশানুক্রমিকভাবে পদগুলি ভোগ চারটে লাওস প্রদেশ, লিগর ও সিংগোরায় স্থানীয় প্রধানরা গভর্নর হিসেবে কাজ করত। মালয়ের আরো কিছু সামন্ত শাসক রাজাকে নজরানা পাঠাত, অন্য বিভাগ তিনটি রাজধানী, প্রাসাদ ও ভূমি—এগুলি রাজার মনোনীত কর্মচারীরা নিয়ন্ত্রণ করত। প্রশাসৈনিক, বিচার বিভাগীয় ও আর্থিক বিষয়কে পৃথক করা হতনা রাজবংশের রাজপুত্ররা উপরাট হিসেবে এসব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হতেন, তাঁদের বেতনের ব্যবস্থাও ছিল। বর্মার মতো রাজপুত্রদের মাইয়োসা জামিদারি ছিল না তারা প্রাদেশিক গভর্নরও হত না। ভয় ছিল স্থানীয় লোকজন নিয়ে কারণ তারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে পারে। লেন্সররা সব গভর্নর ও উচ্চপদস্থদের ওপর নজর রাখত। রাজধানী কাছের শক্তিশালী লোকদের ওপর কঠোর নজরদারি ছিল।

থাইল্যান্ডে সরকারের কাজ ছিল খুব সীমিত। সব বৈদেশিক বাণিজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করত, সব বাণিজ্য ছিল সরকারের একচেটিয়া। বাণিজ্য শুল্ক ও করের ইজারাদাররা বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দূরে রেখেছিল। রাষ্ট্র দস্যু-তস্করদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব নেয়নি। এই দায়িত্ব পালন করত গ্রামসভার বয়োজ্যেষ্ঠরা। বর্মার মতো এখানকার সব স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করা হত সালিশির মাধ্যমে।

ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দায়িত্ব ছিল অপরাধীকে ধরিয়ে দেবার। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও শোষণকারী। জনগণ এদের সযত্নে পরিহার করে চলত। এখানে সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত রাজার ওপর। পাঁচ প্রজন্ম পরে রাজপুত্ররাও উচ্চ সম্মান হারাতেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পুত্ররা প্রাসাদে কাজ করত। গভর্নর ও সামন্ত শাসকদের কন্যারা রাজ প্রাসাদে হস্টেজ বা পণবন্দি হিসেবে থাকত। রাজধানী ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক মাপকাঠি, সামাজিক মর্যাদার বিচারস্থান ও সম্পদের উৎস। জনগণ কর্তৃত্বকে মান্য করত, চিনা পারিবারিক ব্যবস্তা ও ভারতীয় দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের ধারণার মিশ্রণ ঘটেছিল এর মধ্যে। প্রদেশ থেকে রাজধানীতে রাজস্ব আসত, গভর্নররা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বেগার শ্রম আদায় করত। বছরে তিন থেকে চার মাস সরকারকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দান করতে হত। সামরিক কাজের জন্যও বেগার শ্রম নেওয়া হত। বেগার শ্রমের বিনিময়ে অর্থও নেওয়া হত। সোরা, হাতির দাঁত ও চন্দনকাঠও নেওয়া হত। রাজকর্মচারী ও জনগণের মধ্যে আরো এক শ্রেণির মানুষ সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। এরা রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিত। এদের বলা হত পেট্রন, এরা হল বর্মার মাইয়োথুগির থাই সংস্করণ। এই পেট্রন ও জনগণের মধ্যে বক্তিগত সম্পর্ক ছিল। পেট্রন সেবা দেবার বিনিময়ে জনগণকে অত্যাচার ও অপশাসন থেকে রক্ষা করতে পারত। জনগণকে প্রয়োজনে ঋণ দিত। সেবা নথিবদ্ধ করা হত, ব্যক্তির সমাজিক অবস্থান হাতে টাটু করা হত। পিতা ও পুত্রকে সেবা দিতে হত। তবে মক্কেল ইচ্ছা করলে তার পেট্রন বদল করতে পারত। কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবারের সকলকে বিক্রি করে দাসত্ব গ্রহণ করতে পারত। এরকম ক্ষেত্রে পেট্রন তার সেবা হারাত। পেট্রন তার অধীনস্থ ব্যক্তিকে রক্ষায় চেষ্টা করত। জমি ছিল পরিবারের, যতখানি জমি পরিষ্কার করে চাষ করা যায় ততখানি ছিল পরিবারের জমি।

সাধারণভাবে বলা যায় উনিশ শতকের গোড়ারদিকে থাইল্যান্ডের জনস্যখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল দাস। প্রভু দাসের হয়ে রাজকীয় রাজস্ব দিয়ে দিত। এর বিনিময়ে দাস প্রভুর প্রাধান্য মেনে চলত, সেবা দিত। থাইল্যান্ডের দাসদের একাংশ প্যাগোডার সঙ্গে যুক্ত ছিল, অনেকে ছিল ঋণগ্রস্ত দাস, এদের সংখ্যা সাধারণ নাগরিকের প্রায় সমান ছিল। যুদ্ধবন্দিরা রাজার দাস ছিল, এরা রাজার সৈনিক হিসেবেও কাজ করত। এদের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ করা হত—বর্মি, লাওসিয়ান, মালয় প্রভৃতি। বর্মিরা ছাড়া আর সকলে স্বাধীন নাগরিকের মতো থাকত। বিদেশি গোষ্ঠীগুলিকে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা দিতে হত না। অন্য বিদেশি জাতিগোষ্ঠী ছিল চিনারা। এরা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আফিম কালোবাজারির সঙ্গে এদের যোগ ছিল। অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে চিনাদের যোগ ছিল। বাণিজ্যিক দিক থেকে ব্যাংককে বলা হয় চিনা শহর। চিনারা পরিশ্রমী, এজন্য জনকল্যাণমূলক কাজে এদের নিযুক্ত করা হত। বেগার শ্রম দিয়ে এসব কাজ করা যেত না। চিনারা সেবা দিত না, শুধু একটি পোল ট্যাক্স দিতে হত। অনেক চিনা রাজস্বের ইজারাদার হিসেবে কাজ করত। এদের গুপ্ত সমিতিগুলি এদের রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তবে এরা অনেক সময় অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হত। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর শ্যাম দেশ ও চিনাদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দেএরা বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছিল।

জন ক্রফোর্ড ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডের লোকদের দেখেছিলেন, তাঁর ধারণা মন্দ ছিল না। তিনি মনে করেন এরা হল শান্তিকামী সংযত মানুষ। এরা অনুগত, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং প্রতিশোধপরায়ণ নয়। এদের পারিবারিক জীবন ছিল উন্নতমানের, পরিবারের সকলের প্রতি এদের সহানুভূতি ছিল। ধনীরা বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিল, বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল সহজ। থাইল্যান্ডের সরকারি কর্মচারীদের তিনি বলেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত, এদের মধ্যে আনুগত্য ও নিষ্ঠার অভাব ছিল। জাতীয় চরিত্র নিয়ে এরা গৌরববোধ করত। কর্মচারীরা ওপরওয়ালার পদলেহন করত, নিম্নপদস্থদের সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব ছিল। এরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুগত ছিল, এরা চিনাদের মতো কঠোর পরিশ্রমী ছিল না। এরা আমোদ-প্রমোদ ভালোবাসত। পরদিন সম্পর্কে চিন্তা ছিল না, অত্যন্ত আর্ত মানুষকে সাহায্য দিত, কর্মের মাধ্যমে পুণ্য অর্জনের ইচ্ছা ছিল। এদের বলা হয় আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাত না। এরা সত্যকে ঢাকার জন্য মিথ্যা আশ্রয় নিত, তারা নৈতিক বিধি মেনে চলত। গ্রাম থেকে রাজধানী সর্বত্র সামাজিক স্তর বিন্যাসকে মেনে চলা হত। এরা দক্ষ বা প্রগতিশীল ছিল না, তবে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের মতো থাইল্যান্ডের মানুষের ধর্মবিশ্বাস। অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করে চলা ছিল এক ধর্ম, হিন্দু দেবদেবী, সর্পদেবী বা বুদ্ধ অনেক সময় প্রধান্য হারাতেন। এসব প্রাণবাদ ম্যাজিসিয়ান ও জ্যোতিষদের চাহিদা বাড়িয়েছিল। জন্মচক্র ও স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা সম্মান পেত। জ্বর হলে ধরে নেওয়া হত অপদেবতায় ভর করেছে। ভালো দিন গণনা করা হত, মাদুলি, তাবিজ প্রভৃতি ধারণের প্রথা ছিল। রাজসভায় ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরা গণনা করে অপদেবতাকে তুষ্ট করে রাখত। রাজা হলেন দেবতার অংশ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা সব দূর করতে পারতেন। রাজা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী দূর করে পূর্বপুরুষের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চতুর্থ রামের রাজত্বকালে তিনজনকে বলি দিয়ে নতুন দুর্গের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়। কামান দেগে বা সুতো দিয়ে বেঁধে বা অন্যান্য প্রথায় অপদেবতাকে দূর করা হত। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবশালী ছিল, গণ উৎসব ও নাটক হত। ভারতীয় উপকথা ও স্থানীয় লোকশ্রুতি এতে মিশে যেত। মঠের জীবনধারাকে পবিত্র মনে করা হত। প্যাগোডা, মন্দির নির্মাণ বা সন্ন্যাসীদের জন্য ব্যয় পবিত্র কাজ বলে গণ্য হত। বুদ্ধ হলেন হিন্দু দেবদেবীর একজন, কর্ম ও জন্মান্তরবাদকে গ্রহণ করা হয়। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়। থেরাবাদী ধর্মে মঠ জীবনবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়। সংস্কার ও অনুষ্ঠান তেমন গুরুত্ব পায়নি। ভালো কাজ করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তি পেতে হত।

থাইল্যান্ডে মঠজীবনকে বলা হত সংঘরাচ, বর্মার সঙ্গে এর অনেক মিল ছিল। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন ধর্মগুরু কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করতেন, চারটি শাখা থেকে এই কাউন্সিলে সদস্যরা আসত। থাইল্যান্ড একটি বৌদ্ধ আইনসভাও চারটি ধর্মীয় বোর্ড গঠন করেছিল—এই চার বোর্ড প্রশাসন, শিক্ষা, প্রচার ও দাসদের তত্ত্বাবধান করত। এদের ওপরে ছিল মন্ত্রীরা। দশ বছরের থেরাস বা সন্ন্যাসী দীক্ষা দিতে পারত। পালিতে পরীক্ষা দিয়ে দুটি উচ্চপদে ওঠা যেত। সন্ন্যাসীদের মান উন্নয়নের প্রয়াস সফল হয়নি। রাজা মংকুত নিজে ছিলেন ২৭ বছরের সন্ন্যাসী, তিনি মোন ও সিংহলীদের মতো পবিত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তবে ব্যাংককের বাইরে এর তেমন প্রভাব পড়েনি। ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাদের দূর করা সম্ভব হয়নি। সন্ন্যাসীদের বেগার শ্রম দিতে হত না, এই বৌদ্ধ

সমাজ লাভ করেছিল নীতিবোধ, আত্মসম্মান, শিক্ষা ও সমবেদনা।

১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড বিদেশি ইউরোপীদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করেছিল, তবে তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়নি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও বন্ধ হয়নি। ভারত-চিন বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল, আমেরিকা ও ডেনমার্ক এই বাণিজ্য করত। চিনারা তাদের জাঙ্ক নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য চালাত। এই সময়ে ডাচ কোম্পানি দুরবস্থায় পড়েছিল। বাণিজ্য করত। ছিল ব্যাংকক। বিদেশিরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন বাণিজ্যের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ জন ছিলেন চীনা। দেশে বড়ো বড়ো গুদামঘর ছিল বড় বড় বণিক খালের মধ্যে ছিল ভাসমান বণিকের দল। সব জাহাজের নাবিকরা ছিল চীন বিনা বাধায় পণ্য বিক্রি করত, কিনত, অন্য বণিকদের বাণিজ্য এত সহজ ছিল না । ১৮১৮ বা ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মার্কিনিরা দেশে বিক্রির জন্য অস্ত্র শস্ত্র এনেছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে অন্তত ৮০ খানি জাহাজ চিনারা বাণিজ্যের জন্য এনেছিল। ক্যান্টন বন্দর থেকে অনেকগুলি ছোটো বড়ো জাঙ্ক এখানে বাণিজ্য করতে আসত, এদের সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ। সাংহাই ও নিংপো থেকেও জাহাজ আসত। মৌসুমি বায়ুকে অবলম্বন করে জাহাজ চালানো হত। সিঙ্গাপুর ও ব্যাংককের মধ্যেও বাণিজ্য বেড়ে চলেছিল। চোদ্দ বা পনেরোখানি জাহাজ আফিমের বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, অন্য পণ্যও বহন করত। ছোটো জাহাজ বোর্নিও পর্যন্ত গিয়ে ফিরে যেত, এরা বাটাভিক্স ও ম্যানিলাতেও যেত। মালয়ের পূর্ব উপকূলের বাণিজ্য ছিল থাইল্যান্ডের রাজার একচেটিয়া। রাজার জাহাজ দশ-বারোটি বন্দরে দাঁড়াত স্থানীয় পণ্য কেনার জন্য। এগুলি চিনে রপ্তানি করা হত। আমদানি পণ্যের ওপর রাজা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। থাই উপসাগরে এই বাণিজ্য চলত সারা বছর ধরে। রাজা বছরে দু'বার ক্যান্টনে বাণিজ্যের জন্য জাঙ্ক পাঠাত। এগুলি বিনা শুল্কে প্রবেশ করত। প্রতি তিনবছর অন্তর থাইল্যান্ড পিকিং দরবারে নজরানা পাঠাত।

থাইল্যান্ডের জাহাজগুলি দেশে তৈরি হত। এখানে জাহাজ তৈরির ব্যয় ছিল অনেক কম। ২০০ টন থেকে ১২০০ টনের জাহাজ তৈরি হত, এসব জাহাজে দুই থেকে চার মাস্তুল লাগানো হত। ইংরেজ ও মার্কিনিদের জাহাজগুলি সব ঋতুতে চলতে পারত, দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিল। এরা বছরে তিনবার সমুদ্রপাড়ি দিত। এই থাইল্যান্ডের জাহাজগুলিতে পাম্প ছিল না, কম্পাস ছিল জাহাজের সামনে। থাইল্যান্ডে চিনা বণিকরা অনেক সুবিধা পেত, ইউরোপীয়রা এই সুবিধঘা পেত না, সাংহাই বন্দরের দক্ষিণে চিনা বাজারে এরা অবাধে প্রবেশ করতে পারত। ইউরোপীয়রা এই বাজারে ঢুকতে পারত না, এখান থেকে চিনা বণিকরা সস্তায় চা, রেশম ও পোর্সেলদের বাসনপত্র কিনত। চিনা বণিকরা এশিয়ার বাজারকে ভালো রকম চিনত। বণিকরা তাদের পণ্যের সঙ্গে বন্দরে যেত এবং খুচরো বিক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করত। এরা ছিল মিতব্যয়ী এবং পণ্য সংরক্ষণে বিশেষ দক্ষ। এরা এই অঞ্চলের প্রথাগত পণ্য যেমন সুগন্ধি কাঠ, গণ্ডারের শিং, এবোনি, বেনজোইন, কর্পূর ও চামড়া কিনতো। ইউরোপীয়রা এসব পণ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাত না। চিনারা নতুন বাণিজ্য সম্ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারত। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড থেকে ৪৪খানা জাহাজ সিঙ্গাপুরে গিয়েছিল। থাইল্যান্ড ছিল সিঙ্গাপুর বন্দরের দ্বিতীয় ব্যবহারকারী দেশ, প্রথম স্থানে ছিল চিন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকক বাংলার বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ

স্থাপন করেছিল। এর সাফল্য তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। প্রথম অভিযানে বাণিজ্যে লোকসান হয়, ২৪০০০ টিকাল। ডাচরা প্রণালী পথে বহু টাকা আদায় করেছিল। থাইল্যান্ড বাংলা বাণিজ্যকে তেমন বুঝতে পারেনি। থাইল্যান্ড বাংলা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। এই অভিযানের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জন ক্রফোর্ডকে তাদের দুত হিসেবে ব্যাংককে পাঠিয়েছিল। বাণিজ্য বৃদ্ধি করা ছিল ক্রফোর্ডের মিশনের লক্ষ্য।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হিসেবে জন ক্রফোর্ড ব্যাংকক গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল পণ্য ও রাজার জন্য উপঢৌকন। পণ্যের মধ্যে ছিল বস্ত্র, কাঁচ, বন্দুক ও ঘোড়া। ক্রফোর্ড থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চেয়েছিলেন, থাইল্যান্ডের বন্দরে ৬-৮ শতাংশ শুল্কে পণ্য বিক্রি হবে, সব পণ্য অবাধে বিকরি করা যাবে। থাইল্যান্ডের প্রথা অনুযায়ী মেনাম নদীতীরে আগত সব জাহাজকে বন্দুক-কামান জমা দিতে হত। থাইল্যান্ড এর অন্যথা করতে চায়নি। ক্রফোর্ড বিশেষ সুবিধা দাবি করলে সন্দেহ দেখা দেয়, চিনা বণিকরা এই সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। থাই সরকার এই মিশনের ওপর নজর রেখেছিল। টুপি ও জুতো খুলে পা মুড়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে হয়। রাজা ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চেয়েছিলেন। ক্রফোর্ড অতিকষ্টে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে রাজি করান। ক্রফোর্ড অতিকষ্টে কোম্পানির প্রতিনিধির সহেগ কথা বলতে রাজি করান। ক্রফোর্ড প্রথমে পাকনামের গভর্নরের সঙ্গে কথা বলেন, পরে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। একজন ভারতীয় মুসলমান শাহবন্দর ও একজন পর্তুগিজ দোভাষীর কাজ করেন। মিশন জানিয়েছিল পরিবেশ ছিল উদ্ধত ও অর্থলোভী। দরবারে ব্রাহ্মণরা ছিল, দেওয়ালে ছিল রামায়ণের চিত্র। ক্রফোর্ড দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, প্রথমটি বাণিজ্য, দ্বিতীয়টি কেদার সুলতানের অবস্থান। থাইল্যান্ড বাণিজ্য চুক্তির বিনিময়ে ভারত থেকে অস্ত্র কেনার দাবি রেখেছিল। বাংলার সঙ্গে বর্মার বন্ধুত্ব ছিল, আর থাইল্যান্ডের সঙ্গে বর্মার চিরশত্রুতা ছিল। বিদেশমন্ত্রী ব্রিটিশ কোম্পানিকে শুল্ক বা পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিতে রাজি হননি। ক্রফোর্ড অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্যের কথা তুলে সফল হননি। রাজা কেদার (Kedar) সুলতানকে রাজসভায় হাজির হতে বলেন। প্রধান অভিযোগ ছিল সুলতান লিগরের বিরুদ্ধে বর্মার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। ক্রফোর্ড কেদার সুলতানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। ক্রফোর্ড মনে করেন থাইল্যান্ড সামরিক দিক থেকে তেমন শক্তিশালী নয়, পেনাঙ-এর ভয়ের কোনো কারণ নেই এখানে কেদার সুলতান আশ্রয় নিয়েছিল। থাইল্যান্ড কার্যত পেনাঙে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব হিসেবে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় রামের মৃত্যুর পর তৃতীয় রাম সিংহাসন গ্রহণ করেন (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বার্মার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন, জাহাজ নির্মাণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করেন। নতুন রাজা ছিলেন এক অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি অনেকক্ষেত্রে উদ্যোগ নেন। সিংহাসনে তার দাবি ছিল দুর্বল, পিতা রাজা হবার আগে তাঁর জন্ম হয়, তাঁর মাতা ছিলেন সাধারণ পরিবারের কন্যা। উপরাট বা যুবরাজ আগেই মারা যান। অন্যরা ছিল সন্ন্যাসী বা অনভিজ্ঞ। প্রসাদের লোকেরা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, প্রতিদ্বন্দ্বী মংকুত সরে দাঁড়ান। পুরোনো মন্ত্রীরা ছিলেন। এই নতুন রাজসভা প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের পরের সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথম সমস্যা হল প্রথম যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শক্তি টেনাসেরিম দখল করেছিল। এই টেনাসেরিম ছিল থাইল্যান্ডের সম্পত্তি, তৃতীয় রাম ব্রিটিশদের সাহায্য করে টেনাসেরিম পুনরুদ্ধার করতে

চেয়েছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে ব্রহ্মসীমান্ত মারগুইতে অভিযান চালান। ব্রিটিশ শক্তি এখানে প্রবেশ করলে তৃতীয় রাম সৈন্য সরিয়ে নেন। পেনাঙের ব্রিটিশ শাসক গোপনে লিগরের রাজার সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল, এই লিগর ছিল থাইল্যান্ডের মধ্যে। পেনাঙ মালয় সুলতানদের ওপর থাইল্যান্ডের প্রধান্য স্থাপনের বিরোধিতা করে চলেছিল। ১৮২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শক্তি বর্মার বিরুদ্ধে থাইল্যান্ডের সহায়তা নেবার কথা ভেবেছিল। পেনাঙ-এর ব্রিটিশ গভর্নর ফুলারটন যখন দেখলেন লিগর প্রণালী অঞ্চলে থাইল্যান্ড আধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে তিনি শক্তিশালী প্রতিরোধের কথা ভাবেন। তিনি কেদার সুলতানকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চান যদিও থাইল্যান্ড এর বিরোধী ছিল। তিনি পেরাক ও সেলাঙ্গরকে সাহায্য নিয়ে পেরাক থাই আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীন হয়ে যায়।

কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থাইল্যান্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক চেয়েছিল। ফুলারটন সামরি ব্যবস্থার ভয় দেখিয়ে পেরাকর ও সেলাঙ্গরের ওপর থাই আক্রমণের সম্ভাবনা নির্মূল করেন। লিগরের রাজার সঙ্গে পেনাঙ-এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন বার্নি একটি বেআইনি চুক্তি করেন। এর শর্ত লিগর রাজা পেরাক ও সেলাঙ্গর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবেন, বিনিময়ে ব্রিটেন কেদায় (Kedar) হস্তক্ষেপ করবে না। লিগর পেরাক আক্রমণে উদ্যত হলে শাসকদের কলকাতার নির্দেশে বার্নি থাইল্যান্ডে যান। বার্নি থাই সরকারকে জানিয়েছিল টেনাসেরিম অধিকার তার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করবে না। ফুলারটন চেয়েছিলেন যে থাই আধিপত্য থেকে মালয় সুলতানরা স্বাধীন হবেন। বার্নি মালয় সুলতানদের স্বাধীনতার কথা তোলেননি, বাণিজ্যিক সুবিধার কথাও বলেননি। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ান্দাবো চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বার্নি মালয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কের এটা ছিল প্রধান শর্ত। রাজা তৃতীয় রাম সন্দেহ করেন, ব্রিটিশ শক্তি মোন নেতাদের থাই সরকারের বিরুদ্ধে উৎসাহ জুগিয়েছিল। রাজা দেখলেন টেনাসেরিম তিনি ফিরে পাবেন না, এজন্য তিনি ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক সুবিধা ও মালয় রাজা সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না। রাজা ইংরেজ শক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ চাননি, কারণ থাই-লাওস ও থাই-কাম্বোডিয়া সীমান্তে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ব্রিটিশ-থাই চুক্তি ছিল খুবই অস্পষ্ট, এর বিষয় ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা। সুলতানদের সম্পর্কে বলা হয় তারা ব্যাংককে নজরানা পাঠাবেন, অধিনস্থ অবসথা মেনে নেবেন। তবে পেরাকের সুলতানের আধিপত্য দুই পক্ষ মেনে নেয়। একে অক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয় তহে তিনি ব্যাংককে নজরানা পাঠাতে পারেন। থাইল্যান্ড ব্রিটিশের কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। ইংরেজরা ত্রেঙ্গানু ও কেলানতনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে। ব্রিটেন কোনো অজুহাতে এসব রাষ্ট্রকে বিরক্ত করবে না। বার্নি কেদা থেকে থাই সৈন্য সরিয়ে নেবার জন্য বার্ষিক ৪ হাজার ডলার দিতে চেয়েছিলেন। সুলতানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। থাই অনুরোধে ব্রিটেন সুলতানকে পেনাঙ থেকে মালাকার পাঠিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে ব্রিটেন সুলতানকে বল প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে না। কলকাতার সরকার ফুলারটনের আপত্তি সত্ত্বেও এসব শর্ত গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্যক্ষেত্রে থাইল্যান্ড ব্রিটেনকে বিশেষ কিছু দেয়নি। দেশের রীতি মেনে ব্রিটেনকে ব্যবসা করতে হবে। তারা জমি ভাড়া নিয়ে কুঠি নির্মাণ করতে পারে তবে ব্রিটিশ নাগরিক থাই-বিচার ব্যবস্থার অধীন থাকবে। অতিরাষ্ট্রিক অধিকার

ব্রিটেন লাভ করেনি। চাল রপ্তানি ও আফিম আমদানিও নিষিদ্ধ হয়েছিল। জাহাজের বহন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থায়ী শুল্কের ব্যবস্থা হয়, পণ্য মূল্যের ২ শতাংশ দিতে হবে না। বিপর্যস্ত নাবিকরা সাহায্য পাবে। বার্নি কনসুলেট স্থাপনের প্রস্তাবে দেননি, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দুই দেশের চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়।

ব্রিটিশ অধিকৃত টেনাসেরিম বর্মা ও থাইল্যান্ড উভয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য দুই চিরশত্রু যুদ্ধ থেকে বিরত হয়। এই অধিকৃত অঞ্চলের পেছনে ছিল ব্রিটিশ স্থল ও নৌশক্তি, এজন্য দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম নষ্ট হয়ে যায়। থাইল্যান্ড মনে করে টেনাসেরিম ফেরত পেতে হলে মালয়ে খুব বেশি মূল্য দিতে হবে। তাছাড়া এটি দখল করলে বর্মার সঙ্গে পুরোনো বিরোধ শুরু হয়ে যাবে। এই অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনাধীনে এলে জনগণ দুই দেশের শত্রুতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কলকাতা এখানে একটি মোন বাফার রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিল, বা কেদার সঙ্গে বিনিময়ের কথাও উঠেছিল। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মালয়ের কিছু ঘটনা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের চুক্তিকে প্রভাবিত করেছিল। পেরাক সম্পর্কে শর্ত দুই পক্ষই মানেনি। থাইল্যান্ড ভয় দেখিয়ে বা অভিযান পাঠিয়ে পেরাককে অধীনতা মানতে চিন্তা করে। ফুলারটন একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে সুলতানকে থাইল্যান্ডকে অস্বীকার করতে বলেন। ফুলারটনের একজন এজেন্ট পেরাককে, ব্যাংকক ও লিগরকে অগ্রাহ্য করতে পরামর্শ দেন। এইসবের পর ব্যাংকক Kedah-র নিচে উপকূলে সব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় ত্যাগ করেছিল। ব্রিটেন Kedah সুলনানের প্রত্যাবর্তনের বিরোধী ছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফিরে আসে, থাইল্যান্ড অধীনতার বিনিময়ে সম্মতি দিয়েছিল। তিরিশের দশকে থাইল্যান্ড ক্রোস্ ও কেলানতন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালে ব্রিটেন বাধা দেয়নি। পূর্ব উপকূলে তিরিশের দশকে এই ঘটনা ঘটে।

রাজা তৃতীয় রাম মালয় অঞ্চলে থাইল্যান্ডের প্রথাগত কর্তৃত্ব বজায় রাখায় আগ্রহী ছিলেন। তার পূর্ববর্তী শাসকের সময় এই ব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। কাম্বোডিয়াতে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ভিয়েতনাম এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। লাওসের এক রাজপুত্র আগ্রাসী হয়ে উঠেছিলেন। ভিয়েনতিমের প্রিন্স আহন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে এক বিদ্রোহী দমনে থাই সরকারকে সহায়তা দিয়েছিল। এই রাজপুত্র নিজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে লাওসের সৈন্য নিয়ে থাইল্যান্ডের উবন ও কোরাট প্রদেশের কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। গুজব ছিল ব্রিটেন ব্যাংককের ওপর নৌআক্রমণ চালাবে। এই বিদ্রোহ স্থায়ী হয়নি, আহন থাই সৈন্যবাহিনী দেখে ভিয়েতনামে পালিয়ে যান। তৃতীয় রামে সৈন্যবাহিনী ভিয়েনতিন দখল করে লুটপাট চালিয়েছিল। এর একাংশ থাইল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। থাই কর্তৃপক্ষ লুয়াং প্রাবাং ও মেকং জেলায় কিছু অঞ্চল দখল করেছিল। ভিয়েতনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থাইল্যান্ড কাম্বোডিয়ায় প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। ১৮৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে তারা সফল হয়। কাম্বোডিয়ার মধ্যে ভিয়েতনাম বিরোধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। রাজা আং ডুয়োঙ্গ থাই সমর্থনে সিংহাসনে বসেন, পাঁচ বছর পর ভিয়েতনাম তাকে স্বীকার করে নেয়। এরপর কাম্বোডিয়ার রাজা থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম দুই দেশকেই নজরানা পাঠাত। রাজা তৃতীয় রাম এখানকার রাজপুত্রদের বাংককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার আবেদন জানান, প্রতিবেশী ভিয়েতনামে কনফুসীয় পন্থার আধিপত্য ছিল।

রাজা তৃতীয় রাম অনেকক্ষেত্রে সফল হন, তিনি রাজকীয় ও জাতীয় মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন, সামন্ত শাসকদের ওপর রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অর্থে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে থাই রাষ্ট্র অনেকবেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে এর সম্প্রসারণ প্রয়াস টেনাসেরিম, কাম্বোডিয়া ও মালয়ে তেমন সফল হয়নি। চাক্রি রাজতন্ত্র নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল থাইল্যান্ড কতদিন বিদেশি চাপ অগ্রাহ্য করে প্রথাগত সমাজ বজায় রাখতে সক্ষম হবে। থাইল্যান্ডের বন্দরগুলিতে প্রথামাফিক বাণিজ্য চলেছিল। মালয়ের পূর্ব উপকূলের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। পাতানিতে ছিল গৃহযুদ্ধ, ত্রেঙ্গানুতে ছিল জলদস্যুদের উৎপীড়ন। সিয়াম উপসাগরে আইন শৃঙ্খলা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল, বাণিজ্য চলেছিল। ব্রিটিশ জাহাজ এখানে কদাচিৎ আসত কারণ শুল্ক হার ছিল চড়া। ছোটো চিনা জাঙ্কগুলি কোনো শুল্ক দিত না। প্রতিবছর ভারতের করমণ্ডল থেকে দু-তিনখানি জাহাজ বস্ত্র নিয়ে এখানে আসত। চিনারা এখানকার আফিম বাজার দখল করেছিল, সিঙ্গাপুর ও ক্যাপ্টন থেকে আফিম আমদানি করা হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের জন্য দেশে রূপো এসেছিল, দেশ মুদ্রা অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছিল। রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পেয়ে, ২৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল।

তৃতীয় রাম আমেরিকার সঙ্গে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এক বাণিজ্য চুক্তি করেন। থাইল্যান্ড এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল। থাইল্যান্ড আমেরিকা থেকে অস্ত্র আমদানির কথা ভেবেছিল, আর ব্রিটিশ একচেটিয়া বাণিজ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতির আশায় আমেরিকাকে বাণিজ্যিক অধিকার প্রদান করা হয়। আমেরিকাকে সবতাধিক অনগৃহীত দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়, বন্দর শুল্ক ছিল স্বাভাবিক, আর ঐ দেশকে দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে আমেরিকার কনসাল এসেছিল, মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। মার্কিন বণিকরা এর সুযোগ নিয়ে বাণিজ্য বাড়ায়নি তবে মিশনারি কাজকর্মের দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। ১৪০ বছর ধরে থাইল্যান্ডে ক্যাথলিক মিশনারিরা ছিল নির্যাতিত, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে দেশে মাত্র ৬টি রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছিল। ঐ সময় থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা দেশে আসতে শুরু করে। নেদারল্যান্ড থেকে একজন মিশনারি আসেন, তিনি নিউ টেস্টামেন্ট থাই ভাষায় অনুবাদ করেন, থাই-ইংরাজি ডিকশনারি রচনা করেন, কাম্বোডিয়ান ও লাওস ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনে চলে যান সেখানে গুটজলাফ কূটনৈতিক ও অনুবাদের কাজে কৃতিত্ব অর্জন করেন। এখানে প্রেসবিটেরিয়ান ও ক্যাথলিক মিশনারিরাও আসেন। ক্যাথলিকর চার্চ, চ্যাপেল, সেমিনারি ও স্কুল নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখানে তারা মঠও গড়ে তুলেছিল। মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা অনুবাদ, প্রকাশনা, চিকিৎসা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

থাইল্যান্ডের বেশি মানুষ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি তবে তাদের সাংস্কৃতিক অবদান তুচ্ছ করার মতো ছিল না। ক্যাথলিকরা বেশি মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। এখানে আবহাওয়ার জন্য মিশনারিরা বেশি দিন থাকত না, থাই ভাষা ও সংস্কৃতি তারা জানত না। বৌদ্ধধর্মের নিন্দা করলে জনগণ ক্ষুব্ধ হত, থাইরা প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতকে বুঝতে পারেনি, ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ চাইত না। মার্কিন মিশনারিজরা দেশে দেশি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। একজন মিশনারি প্রিন্স মংকুতের

শিক্ষক ছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি ধর্মপ্রচার করার অনুমতি পান। আর এক মিশনারি ডান ব্রাডলি প্রথম গুটি বসন্তের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন ব্যবহার করেন। অন্য আর এক মিশনারির কাছে রাজা মংকুত বিজ্ঞান ও ল্যাটিন পড়েন। মংকুত পশ্চিমি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হন। এসব তিনি থাইল্যান্ডে প্রবর্তন করেন। মংকুত বিদেশ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ দেখান, বৌদ্ধধর্মকে তিনি ম্যাজিক ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন। তৃতীয় রাম ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাথলিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, পরে তাদের প্রকল্প সম্পর্কে সন্দিহান হন। তিনি ক্যাথলিকদের সব গির্জা ধ্বংস করার নির্দেশ দেন, যাজকদের বহিষ্কার করেন। মার্কিন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস পুড়িয়ে ফেলা হয়, অনেক গ্রন্থও পোড়ানো হয়। মার্কিনিদের সঙ্গে আলোচনায় তৃতীয় রাম কোনো সুবিধা দেননি।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় রাম এর বিরোধী রক্ষণশীল অবস্থান নেন। এই বাণিজ্য থেকে রাজা ও রাজকর্মচারীরা লাভবান হত। তিনি রপ্তানি চিনির মূল্য ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দেন, চিনা ইজারাদারদের কার্যের মেয়াদ বাড়িয়ে তিনি বাণিজ্য থেকে আরো আয়ের আশা করেন। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল সম্পান কাঠ, শুকনো মাংস, মাছ, গোলমরিচ ও পাখির বাসা। রাজা বিদেশি মডেলে জাহাজ বানিয়ে চলানোর ব্যবস্থা করেন। এসব জাহাজকে শুল্ক দিতে হত না। এখানে ব্রিটিস নাগরিক হান্টার বহুকাল ধরে বাণিজ্য করতেন। তিনি বাণিজ্য ত্যাগ করে আফিম বিক্রি শুরু করেন, এজন্য তিনি বহিষ্কৃত হন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পাঁচখানি ব্রিটিশ জাহাজ ব্যাংককে এসেছিল। রামের বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতির জন্য এরকম অবস্থা হয়। মার্কিনিরা ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ কলেস্টিয়ারকে ব্যাংককে পাঠিয়ে বাণিজ্যিক বিধিনিষেদ শিথিল করতে বলেছিল। তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, সেনাবদিকে অগ্রাহ্য করেন। ঐ বছর ইংল্যান্ড থেকে জেমনস ব্রুকও এসেছিলেন, জেমস চেয়েছিলেন স্থায়ী দূতাবাস, অতিরাষ্ট্রিক অধিকার, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জমি কেনার অধিকার, স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার ও নরম হারে কর। রাজা জেমস ব্রুকের সঙ্গে কোনো নতুন চুক্তি করেননি। চিনের অভিজ্ঞতার আলোকে রাম বিদেশিদের দেশের বাইরে পাঠাতে চান, পুরোনো পদ্ধতিতে কর ধার্য ও আদায় করেন।

রাজা তৃতীয় রামের রাজসভা ছিল আত্মকেন্দ্রিক, রাজার দৈবত্বে বিশ্বাসী, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা নিয়ে মত্ত ছিল। বিদেশিদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবেনি। এরকম নিদর্শন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছিল না। রাজার অনেক সমান্ত রাজা ছিল, এরা নামমাত্র রাজশক্তিকে মানত। এদের রাজ্যে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থাই রাজার ছিল না। বিদেশি বণিকদের সব দাবি তিনি মেটাতে পারেননি। ব্যাংকক বহুকাল পশ্চিমি সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকতে পারেনি। রাজা মংকুত ও চালালংকর্ণ দেশটিকে পশ্চিমি আধুনিকতার দিকে নিয়ে যান।

১৬-২.২.৪ মংকুত ও চুলাংকর্ণের সংস্কার পদক্ষেপ থাইল্যান্ড কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল?

আধুনিক থাইল্যান্ডের ইতিহাসে দুইজন রাজার শাসনকাল স্মরণীয় হয়ে আছে— মংকুত (১৮৫১-১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) ও চুলালংকর্ণ (১৮৬৮-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ)। এরা হলেন আধুনিক থাইল্যান্ডের স্রষ্টা। মংকুত প্রথম জীবনে বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। চুলালংকর্ণ ছিলেন সেযুগের থাইল্যান্ডের সবচেয়ে আলোকিত

মানুষ, তিনি উদারনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ব্যক্তি ১৯৭৪ ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দুটি আইন পাশ করে দাস প্রথা তুলে দেন। চাক্রি রাজবংশের এই দুইজন রাজার জন্য, চতুর্থ রাম ও পঞ্চম রাম, থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা পায়। দেশটি আধুনিক ও শক্তিশালী হয়। পিতা ও পুত্র উভয়ে পশ্চিমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করেন। এরা আধুনিক শিক্ষালাভ করে মুদ্রণযন্ত্র, সংবাদপত্র, জনগণের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। মংকুত ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজা, তিনি মনে করেন আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আধুনিকতা অবশ্য প্রয়োজন। তিনি উপলব্ধি করেন পশ্চিমি শক্তিতে দূরে সরিয়ে রেখে থাইল্যান্ডের ঐক্য, অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। চিনের মতো মহাশক্তিধর দেশ পশ্চিমি প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। বিদেশি শক্তিগুলি সেখানে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। চিন ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। আধুনিকতার ক্ষেত্রে যে হাত ভেতর থেকে আগ্রহী হস্যে দরজা খুলে দেয় এবং বাহিরের যে শক্তি নতুন সভ্যতা নিয়ে হাজির হয় উভয়েরই অবদান থাকে। রাজা মংকুত ও চুলালংকর্ণ ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করে দেন।

চাক্রি বংশীয় রাজাদের নামের সঙ্গে রাম শব্দটি যুক্ত ছিল। মংকুত হলেন চতুর্থ রাম মংকুত। তার উত্তরাধিকারী পঞ্চম রাম চুলালংকর্ণ।

থাইল্যান্ডে প্রথাগত অভিজাত নির্ভর শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সরকারি কর্মচারীরা ছিল রক্ষণশীল ও দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশে আধুনিক শিক্ষা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল না, সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ে কোনো বাজেট তৈরি হয়নি। দেশে রেলপথ, ভালো রাস্তা, ডাক, তার, বিদ্যুৎ, আধুনিক যন্ত্রশিল্প কিছুই ছিল না। দেশের জনগণের জন্য আধুনির চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। মহামারি প্রতিরোধের প্রষেধক, টিকার কথা দেশবাসী জানত না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এরা ম্যাজিকে বিশ্বাস করত। তাবিজ, কবচ, মন্ত্র ও আচার-আচরণে বিশ্বাস কর। দেশে ছিল মহাজনি কারবার, জুয়া খেলার ব্যবস্থা, আফিম খাওয়া ও দাস প্রথা। বংশপরম্পারায় এই দাস প্রথা চলেছিল। এই প্রথা ছিল অমানবিক ও নীতিহীন। এসব কুসংস্কারের জন্য সমাজ জীবন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়, তীর, ধনুক, বর্শা নিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ করত, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত। আধুনিক সমরবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য কোনো শিক্ষায়তন ছিল না। আধুনিক বর্ষপঞ্জী কী তাও থাইল্যান্ড জানত না, পুরোনো পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা চলত।

রাজা মংকুত বৌদ্ধ শাস্ত্র ও প্রথাগত শিক্ষায় সুপণ্ডিত হয়েও পশ্চিমি শিক্ষা ও ভাবধারায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পশ্চিমি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিজে আয়ত্ত করে তিনি অভিজাতদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ব্যাংককে স্থাপিত হয় কিংস কলেজ। তিনি শুধু পশ্চিমি ভাবধারা গ্রহণ করেননি, তিনি পশ্চিমি শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় রাজপ্রসাদে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত। বৌদ্ধ সংঘগুলিকে তিনি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে উৎসাহ দেন। মিশনারিদের তিনি স্কুল স্থাপন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। তাঁর পুত্র ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় স্বাধীনতা নীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর ভ্রাতা উপরাট চূড়ামণি আধুনিক ভাবধারার প্রসারে খুবই আগ্রহী

ছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স দামরঙের নেতৃত্বে শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এই শিক্ষা বিভাগ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিয়েছিল। মঠ বিদ্যালয়কে এই শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তন করা ছিল আরো কঠিন কাজ। মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন ক্যাম্পবেল থাইল্যান্ডে শিক্ষা বিভাগ গঠনের দায়িত্ব পান। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি হয়নি। পিতা ও পুত্রের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। যোগ্য শিক্ষক ও তত্ত্বধায়কের অভাব ছিল, শিক্ষার মান উন্নত ছিল না।

থাইল্যান্ড ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অপশাসিত দেশ। অভিজাতরা দেশটি শাসন করত, এই শাসনব্যবস্থায় ছিল অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা ইংল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করে বিদেশিদের গ্রহণ করেন, অন্তত ৮০ জন বিদেশি উপদেষ্টা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করত। মংকুত আরো অনেক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিদেশি রাষ্ট্রগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্মানি। মংকুত ও চুলালংকর্ণ দেশ শাসনের জন্য ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইতালিয়ান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এদের দায়িত্ব ছিল কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে সরকারি আয় বাড়ানো, সরকারি আয়-ব্যয়ের তদারকি করা এবং দেশের জন্য বাজেট প্রস্তুত করা। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে চুলালংকর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসেন। প্রশাসন ভালোভাবে পরিচালনার জন্য তিনি দুটি কাউন্সিল গঠন করেন। সরকারি আয় বাড়ে, দুর্নীতি কমে আসে, অপচয় করেছিল। রলিন জ্যাকমিনস নামক এক বেলজিয়ান থাইল্যান্ডের নতুন বিচারব্যবস্থা গঠন করেন। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী প্রিন্স রবি তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেন। তারই উদ্যোগে থাইল্যান্ডে প্রথম আইন শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। থাইল্যান্ডের কারাগার ও পুলিশ ব্যবস্থাও সংস্কার করা হয়।

থাইল্যান্ডের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। অভিজাতরা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে কাজ করত, প্রায় স্বাধীনভাবে চলত। কয়েকটি অভিজাত পরিবার ছিল যাদের রাজতন্ত্র সমীহ করত। প্রিন্স দামরঙ নতুন করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সমগ্র দেশকে ১৮ টি মন্থনে ভাগ করা হয়, এগুলিকে ভাগকরা হয় প্রদেশে, প্রদেশ ভাগ করা হয় গ্রামে, আর গ্রাম বিভক্ত হয় হ্যামলেটে। হ্যামলেটের লোকেরা তাদের প্রধানদের নির্বাচিত করত, প্রধানরা যৌথভাবে গ্রাম প্রধান নির্বাচিত করত। থাইল্যান্ড ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক দেশ, বহু সামাজিক কুপ্রথা দেশের উন্নতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। রাজার দর্শনার্থীকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করতে হত। রাজা চুলালংকর্ণ এই প্রথা তুলে দেন। রাজার মুখের দিকে তাকানো ছিল অপরাধ, এই প্রথাও তুলে দেওয়া হয়। থাই সমাজে সবচেয়ে বড়ো কুপ্রথা ছিল দাসপ্রথা। এই প্রথার মূল উৎপাটন ছাড়া থাই সমাজে আধুনিকতার প্রবর্তন ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা চুলালংকর্ণ এক রাজকীয় আদেশ জারি করে এই প্রথা তুলে দেন। দাস প্রথার সঙ্গে যুক্ত ছিল মহাজনি কারবার ও জুয়া। রাজা মহাজনি কারবার নিয়ন্ত্রণ করে সরকারি বিধি চালু করেন। সরকারী জুয়া তুলে দেন। প্রাই ও সুই শ্রেণির লোকজনকে সামরিক ও পুলিশ বিভাগে

বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হত। দেশের বহু লোক রাজাকে বেগার শ্রম দিত। যেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো আধুনিক সভা দেশে এসব প্রথা ছিল না। সামরিক বাহিনীর সংস্কার, আধুনিক কর প্রথার প্রবর্তন ও মুদ্রা অর্থনীতি থাইল্যান্ডে আধুনিকতার সূচনা করেছিল। পার্শ্ববর্তী ইন্দো-চিন ও মায়ানমারের সঙ্গে তুলনায় থাইল্যান্ড একটি আধুনিক দেশে পরিণত হয়। থাইল্যান্ডের কৃষকদের সামন্ত বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তারা স্বাধীনভাবে জমি চাষ করত এবং চাষের ফলভোগ করত।

থাইল্যান্ড মংকুত ও চুলালংকর্ণ আরো বহু ধরনের আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে অবাধ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়, সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ইতালীর মেজর জেরিনি এই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার পান। চিকিৎসা বিজ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি ও নৌবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব কাজ পরিচালনার জন্য মংকুত ও চুলালংকর্ণ বিদেশি পরামর্শদাতাদের ওপর নির্ভর করেন। তারা রাস্তাঘাট, বন্দর, পোতাশ্রয়, রেলপথ,ডাক ও তার বিভাগ, বিদ্যুৎ এমনকি ট্রামও প্রবর্তন করেন। কয়েকটি জলসেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। থাইল্যান্ডকে বলা হয় প্রাচ্যের ভেনিস, দেশের মধ্যে প্রচুর জলপথ ছিল, এগুলিকে নাব্য করা হয়, পরিবহনের সুলভ ব্যবস্থা হয়। রাজারা অনেকগুলি ভালো রাস্তা নির্মাণ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। পিতা ও পুত্রের দীর্ঘ শাসনকালে দেশে আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। খনি, জাহাজ নির্মাণ ও কাঠ শিল্প ছিল প্রধান। বিদেশিদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য থাইল্যান্ডের বহির্বাণিজ্য বেড়েছিল। থাইল্যান্ডের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চাল, কাঠ ও টিন।

চাক্রিরাজা মংকুত ও চুলালংকর্ণের শাসনকালে পশ্চিমি ভাবধারা ও শিক্ষার প্রবর্তন হলেও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। রাজারা ছিলেন দৈবনুগৃহীত স্বৈরাচারী শাসক। দেশে কোনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল না, জনগণের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। রাজা ও অভিজাতদের মধ্যে আধুনিকতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছিল। রাজা মংকুতের মনেও আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব চলেছিল। রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাহী সমাজে তা ছিল স্বাভাবিক। স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী বিদেশি পরামর্শদাতাদের পছন্দ করত না, তারা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করত। রাজা মংকুত ও চুলালংকর্ণ রাজসভা ও প্রাসাদের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার তেমন লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়নি, আধুনিক সংস্কারগুলি সাধারণ মানুষকে খুব বেশি স্পর্শ করেনি। জনশিক্ষার প্রসার ঘটেনি, আধুনিক পশ্চিমি শিক্ষা উচ্চবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদের সংস্কারের এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় এরা থাইল্যান্ডে পরিবর্তনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে কোনো শাসক এই ধারার পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। প্রগতির কাঁটাকে পেছনে ঘোরানো সম্ভব হয়নি। তাদের সংস্কারের ফলে পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন প্রজন্ম ও নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়।

আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। কিন্তু থাইল্যান্ড কখনো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে স্থাপিত হয়নি। এই দেশ তার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, অখণ্ডতা বজায় ছিল। এই অঞ্চলের সবদেশে ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপিত হয়, ব্যতিক্রম হল

থাইল্যান্ড। ঐতিহাসিকরা এর কারণ খুঁজেছেন। প্রথম কারণ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর কোনো দেশে এমন পশ্চিমিকরণ হয়নি। অস্বীকার করা যায় না মংকুত ও চুলালংকর্ণের সংস্কারের ফলে দেশটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিদেশি উপদেষ্টাদের পরিচালিত শাসন বাণিজ্যের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক গুরুত্ব একে বিদেশি আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়েছিল। মায়ানমার ছিল ব্রিটিশ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, আর ইন্দো-চিন ছিল ফরাসিদের দখলে। মাঝখানে ছিল থাইল্যান্ড। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স একে তৃতীয় বাফার হিসেবে গণ্য করেছিল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে পরস্পর থেকে দূরে রেখেছিল। স্বাধীন থাইল্যান্ডকে তৃতীয় নিরপেক্ষ বাফার হিসেবে রাখা ছিল ইংল্যান্ডের বিদেশনীতির লক্ষ্য। থাইল্যান্ড মালয় সীমানেচ কেদা, পারলিস, কেসানতন ও ত্রেঙ্গানুরের ওপর সব দাবি ত্যাগ করে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ৯০,০০০ বর্গমাইল অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। এরফলে থাইল্যান্ডের খুব ক্ষতি হয়নি, দেশটি আরো ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়েছিল (more compact and homogeneous country)। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সঙ্গে এক চুক্তি করে থাইল্যান্ডের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাছাড়া, থাইল্যান্ড ইউরোপের সব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এই দেশগুলি থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য করত এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। থাইল্যান্ডে জার্মানির অনুপ্রবেশের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ইংল্যান্ড সতর্ক দৃষ্টি রাখায় তা সফল হয়নি। দুই আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী শক্তির মধ্যে এর নিরপেক্ষ অবস্থান এবং বহু ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এর স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

১৬.১২.৫ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) Write about the reformation of Mation of Mankut and Chulangkaran.

(২) Discuss about the Land and Peopled of South East Asia.

পর্যায়-২

থাইল্যান্ড ও পশ্চিমী বিশ্ব

১৬.২.৩.১—সূচনা

১৬.২.৩.২—জমি

১৬.২.৩.৩—থাইল্যান্ডে চাল বিপ্লব

১৬.২.৪.৪—১৯৩২-এর বিপ্লবের পটভূমি

১৬.২.৪.৫—১৯৩১-৪৫ থাই রাজনীতি

১৬.২.৫.৬—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর থাইল্যান্ডের রাজনীতি

১৬.২.৫.৭—সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১৬.২.৩.১—সূচনা

এই পর্যায়ে আমরা থাইল্যান্ডের অর্থনীতির সাথে সাথে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করব। ১৯৪৫-এর আগে ও পরে থাই রাজনীতির কীভাবে পটপরিবর্তন হয়, তা জানা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে।

১৬.২.৩.২—জমি, কৃষি ও দারিদ্র

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী থাইল্যান্ডের লোকসংখ্যা হল ২১,৪৭৪০০০, মোট আয়তনে ১৯৮,৪৫৪ বর্গমাইল। এর মধ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হল ১৬,৯৪৬,৮২৪ একর। মোট জমির ১৩.৪ শতাংশে কৃষি কাজ হত। প্রধান কৃষিত পণ্য হল ধান, রাবার, নারিকেল, ভুট্টা, তামাক, বাদাম, আখ, তল, তুলো, বিন ও কেনাফ। দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই কৃষির ওপর নির্ভরশীল, চাক্রি রাজরাও এটাতে তাদের রাষ্ট্রনীতি হিসেবের গ্রহণ করেন। তারা মনে করেন এটা রাষ্ট্রের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। সমস্যা হল থাইল্যান্ডের মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে রয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকেও এর তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো থাইল্যান্ডের লোকেরা ছিল দরিদ্র। অর্থনীতির সবচেয়ে পুরোনো ও অলাভজনক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছিল। এক্ষেত্রেও সর্ব্বোচ্চ স্তরে বিদেশীরা ছিল কৃষির নিয়ন্ত্রক ১৯৩২ এর বিপ্লবের পর উগ্র জাতীয়তাবাদ এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। চাল ভান্ডার দেশের কৃষক সমাজ কিন্তু তা থেকে তেমন উপকৃত হয়নি এশিয়ার অন্য দেশের কৃষকের সঙ্গে তুলনার তার অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। থাই কৃষক ছিল দরিদ্র কিন্তু খোরাকি নির্ভর কৃষি অর্থনীতির মত অবস্থা তার ছিল না এর ওপরে ছিল তার স্থান। থাই কৃষকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঋণভারে সে জর্জরিত ছিল না। গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা ছিল, সারা দেশেই ছিল, কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল তবে দেশের ভূস্বামীদের দৌরাত্ম ছিল না, বেশিরভাগ ঋণ ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, এসব ঋনের জন্য সুদ দিতে হত না।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে জিমারম্যান যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় মধ্যাঞ্চলের সমতল ভূমির প্রায় ৫০ শতংাশ কৃষকের ঋণ ছিল। থাইল্যান্ডের কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ হল ১৪৩ মিলিয়ন বাহত(Baht)। মধ্যাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ কৃষক ছিল প্রজা কৃষক। তবে জমির স্বত্বাধিকারী হলেই কৃষকের সমৃদ্ধি আসত না, এটি দারিদ্র্যের কারণ হতে পারত। জনগণ উচ্চ কর দিয়ে ভালো জমি পেতে চেয়েছিল। রাংসিট জলসেচ সেবিত অঞ্চলে জমির চাহিদা ছিল বেশি, জমির দামও ছিল বেশি। আঞ্চলিক কর হার থেকে এই অঞ্চলে কৃষকের দেয় কর কম ছিল। ঋণের দায়ে জমি অধিগ্রহণের ঘটনা ছিল খুব কম। পার্শ্ববর্ত ইরাবতী উপত্যকায় এই ধরনের জমি অধিগৃহীত হত। এর কারর হল এখানে প্রচুর চাষের জমি সহজলভ্য ছিল, এবং ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। জমির প্রাচুর্য ছিল, কৃষক জমি চাষ করতে বাধ্য ছিল। এজন্য জমির দাম কম ছিল, জমি বন্দোবস্ত নেওয়া মোটেই শত ছিল না। দেশের মোট ১৬ মিলিয়ন একর জতিতে চলসেচের প্রয়োজন চিল, সেচ ব্যবস্থা ছিল মাত্র ১ মিলিয়ন একেরর একটু বেশি জমিতে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ১৬ মিলিয়ন একরের জমিতে কৃষি কাজের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে, জমিদারদের বড়ো বড়ো জোতগুলির আয়তন কমতে থাকে। এর একটি অন্যতম কারণ হল মায়ানমার বা ইন্দো-চিনের মতো এখানে ধান উৎপাদনে রাষ্ট্র বা বেসরকারি ব্যক্তি প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করেনি। এখানে জলসেচ ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে ধীরে ধীরে, এজন্য এখানে জমির হস্তান্তর তেমন ছিল না। থাইল্যান্ড যে চাল বিপ্লব ঘটে যায়

তা প্রধানত হল কৃষকদের অবদান। ছোটো খেতেরর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। বৃহৎ জমিদারিগুলি বেগার শ্রমিকের অভাবে দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। এটি আরো স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর যখন দাস প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। ছোটো, ক্ষুদ্র চাষিকে উৎসাহ জোগাত, দেশের পরিবর্তনও এর সহায়ক হয়। রাজা চুললাংকর্ণ প্রথাগত ভূমিদার প্রথা বা সাকদিনা প্রত্যাহার করেছিলেন। জমি সাফ করে দখলদারি অধিকার স্থাপন করা আর সম্ভব হয় নি। থাই রাজকীয় সরকার জমির পরিমাপ করে মালিকের স্বত্ব নির্ধারণ করে দেয়, কৃষক জমির অধিকার লাভ করে, সার্ভে বিভাগ কাজ করতে শুরু করেছিল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্কোয়াটারদের অধিকার বাতিল করে টোরেনস বা প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। আধুনিক সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপর সরকার এসম্পর্কে যেসব ব্যবস্থা নেন তাতে কৃষক তার জমির ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার পেয়েছিল। সরকার তার জমি এমন শর্তাধীনে বিক্রি করেছিল যাতে চাষি জমির মালিকানা পায়। যতখানি জমি একটি কৃষক পরিবার লাভজনকভাবে চাষ করতে পারে তা তাকে দেওয়া হয়। টোরেন্স ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গোড়ারদিকে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, পরে এই ব্যবস্থা কৃষক সমাজের খুব পছন্দ হয়, তারা এটিকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কে রছিল। সরকারি সার্ভে দপ্তর প্রতিবছর অন্তত ১ শতংাশ জমিতে জরিপ চালিয়েছিল, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক-তৃতীয়াংশ জমিতে জরিপ চালিয়েছিল, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ এক-তৃতীয়াংশ জমিতে তাদের কাজ শেষ হয়েছিল। এসবের ফলে যা হল তা কৃষি ব্যবস্থার জমিদারতন্ত্রের বিস্তারের বিরোধিতা। বড়ো জমিদারি গড়ে উঠতে পারেনি। সরকার কৃষিকে উৎসাহ দিয়েছিল, ক্ষুদ্র কৃষক তার জমির অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। দক্ষিণের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জমি নিয়ে ফাটকবাজি ছিল, এখানে বিদেশি স্বার্থ সক্রিয় ছিল। বিশ্ব বাজারে টিন ও রাবারের চাহিদা বেড়েছিল, মালিকানার হস্তান্তর চলেছিল, লাভবান হয় সরকারি কর্মচারী ও চিনা বণিকরা। ব্যাংককের কাছে জমি নিয়ে ফাটকাবাজি শুরু হলে সরকার আইন করে তা বন্ধ করেছিল।

একথা ঠিক থাই কৃষকের অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশের কৃষকের চেয়ে ভালো ছিল। তাসত্ত্বেও গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা ছিল। বিশ ও ত্রিশের দশকে তা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে কৃষিকে অজন্মা হলে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা বেড়েছিল, মহামন্দার সময় মধ্যাঞ্চলের ধান চাষি ও উত্তর-পূর্বের খোরাকি নির্ভর চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব বাজারে চালের চাহিদা কমেছিল। সমবায় সমিতির পরিসংখ্যানে এই চিত্র ধরা পড়ে, ১৯৩২-৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃষকেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, প্রচুর আবেদন জমা দিয়েছিল। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সমস্যা ছিল মধ্যাঞ্চলে ও চিয়েংমাই অঞ্চলে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ গ্রামীণ ঋণের ৮০ শতাংশ ছিল এই অঞ্চলে। জিমারম্যান ও অ্যান্ড্রুজ যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় ঋণভার বেশি ছিল মধ্যাঞ্চলে, ক্রমশ তা বেড়ে চলেছিল। দেশের অন্যান্য স্থানে ঋণসংক্রান্ত সমস্যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রজা স্বত্বের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য মধ্যাঞ্চলে বিশেষ করে বেঙ্গলং রংসিট জেলার ছোটো চাষিদের সংখ্যা বেড়েছিল। প্রমাণ করে ৮০ শতাংশ ছিল চাষী প্রজা-কৃষক। এরা স্থানীয় ইজারাদারদের কাছে খাজনা জমা দিত, জমিদাররা শহর বাস করত। এসব জেলার ক্ষুদ্র কৃষকের অস্থি ছিল বিপন্ন কারণ এই কৃষি কাজ আন্তর্জাতিক চাল বাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে অনেক ধনী বণিক ও

ভূস্বামী ছিল, উত্তর থেকে শ্রমিকরা আসত কাজের খোঁজে। মহামন্দার প্রাক্কালে এখানে জমির দাম বেড়েছিল। এখানে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল ভূমিহীন। এটি হল জাতীয় গড়ের দুই গুণ। দারিদ্র্য বেড়েছিল, সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কৃষকের দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি থাইল্যান্ডে সক্রিয় ছিল। থাইল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীরা দালাল ও মহাজনদের কৃষকের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করেছিল। এদের বেশিরভাগ ছিল চিনা, তবে অনুসন্ধান করে জানা যায় থাই মহাজনদের অত্যাচারের মাত্রা ছিল বেশি। থাইল্যান্ডের সর্বত্র চিনা মহাজনদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। এরা বণিক, অগ্রিম দিত, পরিবহন ব্যবসায়ী, ভূস্বামী ও খাজনাভোগী। দালালরা লাভবান হত কিন্তু তাদের ঝুকিও ছিল বেশি, দেশে ভালো ঋণ সংস্থা ছিল না, ওজন ও পরিমাপের সুব্যবস্থার অভাব ছিল। মহাজনদের বাজারের ওঠানামা ও কৃষকের মর্জির ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হত। অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকায় দালাল ছাড়া পণ্য বিক্রি করা সহজ হত না। দালালরা উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত। বিশ্ববাজারে চালের দামে ওঠানামা ছিল, এজন্য পণ্যের দাম বেশি হত। কৃষকরা আলোচনা করে তার পণ্যের দাম স্থির করত, মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম নিত। অগ্রিম না দেওয়া হলে কৃষক বাঁচত না। কৃষকের দারিদ্র্যের অন্য কারণ হল গ্রামাঞ্চলে ঋণদান সংস্থার অভাব। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগে সরকার সুগঠিত কৃষি ঋণদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল কৃষক মহাজনের কাছে যেতে বাধ্য হত। কৃষকের কথা বলার কোনো সুযোগ বা পরিসর ছিল না। জিমারম্যান ও অ্যান্ড্রুজ উভয়ে বলেছেন যে বেশিরভাগ কৃষি ঋণ আসত বন্ধ বা বন্ধু পরিবার থেকে। সুদ দিতে হত না, ১৯৩০ দশক থেকে কৃষক কুসীদজীবীদের কাছে যেতে বাধ্য হয়। সরকারি সুদের হারের দুই গুণ সুদ দিতে হয়। কৃষক ছিল অজ্ঞ, বাজার জানত না, কোথা থেকে ঋণ পাওয়া যায় তাও জানত না। প্রজাস্বত্ব বড়ো ধরনের কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে আসেনি, এই ধরনের সমস্যা ছিল মায়ানমারে, ফরাসী ইন্দো-চিনে ও ফিলিপনসে।

তবে সম্পত্তির অনিশ্চয়তা ছিল। উচ্চ করভার ছিল এবং জমির উন্নতি ঘটানার প্রয়াস বাধা পায়।

ক্রমশ কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, সরকার কৃষকদের রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, কৃষি অর্থনীতির তেমন উন্নতি হয়নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে সরকার বড়ো ধরনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পর সরকার কৃষক ও কৃষি অর্থনীতি নিয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথম ব্যবস্থা হল সমবায় গঠন করা। প্রথমে খুব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, অনেকটা রক্ষণশীল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য বিভাগ সিয়াম কমার্শিয়াল ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে সমবায় চালু করেছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এসম্পর্কে স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হয়, পরীক্ষামূলক পর্ব শেষ হয়ে যায়। সমবায়ের সংখ্যা ৬০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২১৯, ২০০০ সদস্য ছিল। সমবায় আন্দোলন বেড়ে চলেছিল তবে পদক্ষেপ ছিল সবাধানী ও রক্ষণশীল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পর সমবায় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, কৃষকেরা উপকৃত হয়। তবে সমগ্র কৃষি অর্থনীতির ওপর সমবায়ের প্রভাব ছিল সীমিত। গ্রামীণ দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে এর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। দরিদ্র কৃষক সমবায়ের সদস্য হতে পারত না, এর প্রধান নির্ভরতা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থের ওপর। যারা এই সমবায় ব্যবহার করত তারা সকলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

প্রয়াস চালাত, সকলের উন্নতি সাধনের প্রয়াস ছিল না। ১৯৩০ দশকে কৃষকেরা যে অভিযোগপত্রগুলি জমা দিয়েছিল সেগুলি এর বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল। এর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ হল কৃষক নয়, এগুলি দালালদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংস্থা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগে মাত্র ২ শতাংশ কৃষি ঋণের জোগান দিয়েছিল। সরকার এই সমবায় আন্দোলন প্রসারের ওপর জোর দিয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সমবায় কৃষি বিভাগের অধীনে স্থাপিত হয়। বাজেট বরাদ্দ বেড়েছিল, সরকার এর মাধ্যমে কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়াস চালিয়েছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পর উগ্র জাতীয়তাবাদী আমলে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করার জন্য অনেক পরিকল্পনা করা হয় তবে এসব প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। স্থির হয় একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করা হবে। চাল বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত দালালদের সরিয়ে সরকারি এজেন্সি চাল ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। বিপ্লবের আগে এই প্রকল্প তৈরি হয়। ব্যাংকক বন্দরের সম্প্রসারণ ঘটানে হবে, থাইদের বাণিজ্যিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। লুয়াং প্রেডিট ক্ষমতাচ্যুত হলে এই প্রকল্পও বাতিল হয়, তার ভূমি সংস্কার প্রকল্পও বাতিল করা হয়। জাতীয় শ্রমও নেওয়া হবে না। এই সময় থেকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাপন্ন সব প্রকল্পকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতে থাকে। সরকারী জমি দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের প্রস্তাব ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইনসভায় হেরে গিয়েছিল।

১৯৩৮ খ্রীঃ পিবুন সংগ্রাম ক্ষমতা লাভ করলে পরিস্থিতি পাল্টো যায়। থাই রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক পথ ধরেছিল। এসব দেশে পরিবর্তনের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে থাই রাইস কোম্পানি গঠিত হয়, এর লক্ষ্য ছিল চাল বানিজ্যিকে চিনা প্রভাবমুক্ত করা। চিনাদের চালকলগুলি অধিগ্রহণ করা হয়, এই কোম্পানি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কিনতে শুরু করে দেয়। রাষ্ট্র থেকে ঋণ নিয়ে কৃষক ভালো বীজ কিনেছিল, চল্লিশের দশকে রংসিট অঞ্চলে অনেকগুলি চাল ক্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এরা ধানও কিনত। ধান জমির ওপর সরকারি কর ২০ শতাংশ হ্রাস করা হয়। সরকারের সব প্রয়াস সত্ত্বেও ১৯৩২-৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয়নি। সমবায় আন্দোলন তেমন সফল হয়নি, দেশের ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা আধুনিক করা হয়, তবে নতুন ব্যবস্থা সর্বত্র প্রবর্তিত হয়নি। দেশের সর্বত্র ধান-চালের গুদাম তৈরি করাও সম্ভব হয়নি। প্রাদেশিক স্তরে সরকারি এজেন্সি স্থাপনের প্রকল্পও বাস্তবায়িত হয়নি। থাই রাইস কম্পানির হাতে মূলধন থাকা সত্ত্বেও দেশের চালের বাজারে এর তেমনি প্রভাব পড়েনি। আসলে গ্রামীণ দারিদ্র্য সমস্যা ছিল অত্যন্ত জটিল, গভীরে ছিল শিকড়, দ্রুত এর সমাধান সম্ভব ছিল না। কৃষি কাজ করে তেমন লাভ হত না। থাইল্যান্ডে কৃষি বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল খুব কম। জাতীয় আবেগ বিদেশি সাহায্য নেবার পথ রোধ করেছিল। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সামাজিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, তা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না।

১৬.২.৩ থাইল্যান্ডে চাল উৎপাদনে বিপ্লব

উনিশ শতকের থাইল্যান্ডের চাল বিপ্লবের পশ্চাতে রয়েছে ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির রক্ষণশীলতা এবং রেলভিত্তিক পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সঙ্গে থাইল্যান্ডের যে চুক্তি হয় (বাউরিং চুক্তি) তার ফলে ঐ দেশের ওপর ইংল্যান্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

থাইল্যান্ডের ৭০ শতাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ইংল্যান্ডের সঙ্গে। থাইল্যান্ডে লগ্নিকৃত পুঁজি, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংকিং-এর ৯৫ শতাংশ ছিল বিদেশিদের হাতে। থাইল্যান্ডের চারটি পণ্যের মধ্যে কাঠ, টিন ও রাবার) তিনটি নিয়ন্ত্রণ করত বিদেশিরা। এদেশের আধুনিক শিল্পের উন্নতি হয়নি বিদেশ থেকে বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হত। থাই অর্থনীতি দুই ধারা—বিদেশি নিয়ন্ত্রিত শিল্প উৎপাদন ও দেশিদের কৃষি অর্থনীতি পাশাপাশি বহমান ছিল। দেশে ছিল কার্যত দ্বৈত অর্থনীতি। বিদেশদের আগমণ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাইল্যান্ডের মাথাপিছু আয় বাড়ায়নি, সত্যিকারের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। কৃষিতে পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাব ছিল, উৎপাদন হার ছিল বেশ কম।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে থাইল্যান্ড তার রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিল, কিন্তু ভয় পেয়েছিল পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদকে। এজন্য শাসকেরা রক্ষণশীল অর্থঅনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। টাকার (বহত) মূল্যমান তারা সর্বদা বজায় রাখেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কারেন্সি আইন পাশ করে রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা বজায় রাখা হয়। সরকার বিদেশি পুঁজি ও বিদেশি ব্যাংকের ওপর নির্ভর করতে থাকে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডের মোট এগারোটি কমার্শিয়াল ব্যাংকের মধ্যে মাত্র ৪টি ছিল স্বদেশি। বিদেশিরা বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশি মুদ্রার লেনদেন, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করত। অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা ছিল ইংরেজ। থাইল্যান্ডের ইংল্যান্ডের রক্ষণশীলতার পথ ধরেন। থাইল্যান্ড বিশ্ব বাজারে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, দেশের মধ্যে অবাধ, মুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তন করা হয়। সরকার মুদ্রামান বজায় রাখার দিকে নজর রেখেছিল। এর লক্ষ্য ছিল বিদেশি পুঁজিপতিদের আকৃষ্ট করা। সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো তৈরির কাজে অর্থ বিনিয়োগ করেনি, এই কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি।

সরকার দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিল। জল, স্থলপথ ও রেলপথের বিস্তার ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে থাইল্যান্ড সবচেয়ে ভালো রেলপথ বানিয়েছিল। বিমানপথে যাতায়াতে থাইল্যান্ডে ছিল পথিকৃৎ। বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নিয়ে সরকারি উদ্যোগে রেলপথ স্থাপন করা হয়। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাছে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়নি। থাইল্যান্ডে ভালো রাস্তা ছিল না, ভালো রাস্তা ছিল খুব কম। পরিবহনের কাজ চলত নদী ও খালপথ দিয়ে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকক থেকে পাকনাম পর্যন্ত প্রথম রেলপথ চালু হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডে রেলপথের দৈর্ঘ্য হল ১৯০০ মাইল। বিশ ও তিরিশের দশকে রেলপথের অভুতপূর্ব বিস্তার ঘটে। উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ২১৯ মিলিয়ান বহত (টাকা) রেলপথে লগ্নি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০ শতাংশ পুঁজি এসেছিল বিদেশিদের কাছ থেকে। থাইল্যান্ডের ভালো স্থল পথের অভাব রেলপথ বেশ লাভজনক হয়েছিল, এর প্রধান কারণ হল পরিবহন রেলপথ তার চাল পরিবহন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে রেলপথ মাশুলে অনেক ছাড় দিয়েছিল জলসেচ ব্যবস্থা ও রেলপথ থাইল্যান্ডের চাল বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়েছিল।

তিরিশের দশকে স্থলপথের উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সরকার আঠারো বছরে ১৫৩ মিলিয়ন বহত ব্যয় করে ৯০০০ মাইল রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল। এই প্রকল্পের অনেকখানি বাস্তবায়িত হয়। রেলপথ, জলপথ ও বড়ো সড়কের সঙ্গে সরকার ডাক ও তার বিভাগ গঠন করে

যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছিল। ৫০০০ হাজার মাইল টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়েছিল। এই পটভূমিকায় থাইল্যান্ডের চাল উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে যায়। মধ্য যুগ থেকে এদেশের মানুষ জীবিকার জন্য ধান চাষ করত (subsistence crop)।উনিশ ও বিশ শতকে চাল রপ্তানির উদ্দেশ্যে ধান চাষ শুরু হয় (cash crop)। জীবিকার জন্য চাষ অর্থকরী ফসলের চাষে রূপান্তরিত হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগেও ধান চাষ ছিল ঐ দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। থাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন হল ধান। থাইল্যান্ডের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ধান চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ধান উৎপাদনে থাইল্যান্ড ছিল পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। সরকার তার রাজস্বের ৭০ শতাংশ সংগ্রহ করত ধান চাষ থেকে। চাল রপ্তানি করে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগ উপার্জন কতর। মোট চাল উৎপাদনের ২০ শতাংশের বেশি থাইল্যান্ড বিশ্ব বাজারে রপ্তানি রকত। ১৯৫১-৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩.২০ মিলিয়ন একরে ধান চাষ করা হয়, মোট উৎপাদন ছিল ৪.৫০ মিলিয়ন টন, এর মধ্যে রপ্তানি করা হয় ১.৩৩১ মিলিয়ন টন। থাইল্যান্ডে যে কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হয় তার ৯২-৯৫ শতাংশ হল ধান। ৯০ শতাংশ কৃষি জমিতে ধান চাষ হয়। এই পর্বে ধানের মোট উৎপাদন বেড়েছিল, চাল বিদেশে রপ্তানি করা হত। ১৮৫০-১৯৫০ সময়কালে থাইল্যান্ডের চাল রপ্তানি ২৫ গুণ বেড়েচিল। চাল রপ্তানি করা হত মালয়, জাপান, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও, ইংল্যান্ড, ফিলিপিনস ও নেদারল্যান্ডে।

থাইল্যান্ডের চাল উৎপাদন বিপ্লবের এক বৈশিষ্ট্য হল বেশি জমি ধান চাষের আওতায় এসেছিল, মাথাপিছু বা একর প্রতি উৎপাদন তেমন বাড়েনি। থাইল্যান্ডে ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত হয় ছোটো জোতের মালিক কৃষক (small holder)। এখানে মায়ানমার বা কোচিন চিনের মতো জমিদার, প্রজা বা ঋণগ্রস্ততা ছিল না। উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হয়নি, এজন্য মোট উৎপাদনে অবনতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ক্রমাগত চাষের জমি ধান চাষের আওতায় এলেও মোট উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়নি। মধ্য উনিশ শতকে ২.৫ মিলিয়ন একর জমিতে ধানের চাষ ২৩, ৩৫-৩৯ সালে হয় ৭ মিলিয়ন একর ধান চাষের সম্প্রসারণ চাষের প্রধান কেন্দ্র ছিল মধ্যাঞ্চলের সমতল ভূমি। ধান উৎপাদনের ৬০ শতাংশ ছিল এই অঞ্চলে। রপ্তানি চালের সবটাই এই অঞ্চলে অঢেল বৃষ্টি হত, বন্যার জলে তিনমাস ডুবে থাকত ওই অঞ্চল। নদী ও খালপথে পরিবহন ব্যয় ছিল খুব কম, কাছেই ছিল বন্দর। উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেলপথ স্থাপিত হলে সেখানে ধান চাষের দ্রুত সম্প্রদারণ ঘটে। দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপন্ন হত টিন ও রাবার।

ধান চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল, কিন্তু উৎপাদন হার তেমন বাড়েনি, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর উৎপাদন হার কমতে থাকে। বিশ শতকের মধ্যভাগে কোরাট ও মধ্যাঞ্চলে প্রতি একর উৎপাদন কমেছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর দুটি কারণ ছিল—জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। উন্নত প্রযুক্তি কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়নি। ছোটো কৃষক তার প্রথাগত পদ্ধতিতে ধান চাষ করে লাভবান হত, কিন্তু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটানোর মতো মূলধন তার ছিল না। চাল উৎপাদন বিপ্লবের আসল কারণ হল বিশ্বের বাজারে থাই চালের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে চালের রপ্তানি বাড়তে থাকে, ১৯৩০ দশকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১.৫ মিলিয়নট টন, যার মোট মূল্য হল ৯৫ মিলিয়ন বহত (টাকা)। রপ্তানি বেড়েছিল পনেরো গুণ। বিদেশি পণ্য বিশেষত করে বস্ত্র থাইল্যান্ডের বাজারে প্রবেশ করেছিল।

কৃষকের অর্থকরী ফসলের প্রয়োজন হয়, সরকার ধান চাষে উৎসাহ দিয়েছিল। সস্তা পরিবহন, ভূমি ও রাস্বনীতি ধান চাষের সহায়ক হয়। সরকার দাস প্রথা ও বেগার শ্রম প্রথা তুলে দিয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের পর সরকার ঋণদান ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দানের ব্যবস্থা করেছিল। ধান চাষ অঞ্চলে খুব সহজ শর্তে কৃষকদের জমি দেওয়া হয়। নতুন আবাদি অঞ্চলে অন্তত তিন বছর সরকারকে রাজস্ব দিতে হত না।

রাজা মংকুত ও চুলালংকর্ণ জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজ মংকুতের আমলে মধ্যাঞ্চলের চাল উৎপাদনকারী অঞ্চলে নতুন পাঁচট খাল কাটা হয়। চুলালংকর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি খাল কাটিয়েছিলেন। তাতেও সেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। এই খালগুলির জল ব্যবহার করা যায়, জল নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সিয়াম ক্যানালস, ল্যান্ড অ্যান্ড ইরিগেশন কোম্পানিকে ব্যাংককের উত্তর-পূর্ব রংসিট অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এই কোম্পানি একাজে ব্যর্থ হয়। ডাচ সেচ বিশেষজ্ঞ J. M. Vander Heide চারটি জলসেচের পরিকল্পনা করলেও ফেমলি বাস্তাবায়িত হয়নি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস ওয়ার্ড মধ্যাঞ্চলে জল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেন তিনি প্রসাক ক্যানাল ব্যারেজ নির্মাণ করেন। তাছাড়া জিয়েন প্রাক তা ব্যাং হিয়া ড্রেনেজ স্কিম রূপায়িত হয়। সুভান নদী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ থাইল্যান্ডের ১.১ মিলিয়ন একন জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই খাতে সরকার ৪৫ মিলিয়ন বহত ব্যয় করেছিল। তবে এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট ছিল না, ধান চাষ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল রয়ে যায়। বছরে মাত্র একবার ধান চাষ হত, সারের ব্যবহারল বাড়েনি। চাল রপ্তানি পণ্য হওয়ায় চিনা বণিকরা ধানকল স্থাপন করেছিল। মেনাম নদীর ধারে সারি সারি চাল কলগুলি গড়ে ওঠে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই দেশে সত্তরটি আধুনিক চালকল চিল, শতকের মধ্যভাগে এর সংখ্যা হল ৫০০। থাই চালের ক্রোতা হল পশ্চিম ইউরোপ, মালয়, চিন ও জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চালের ক্রেতা হল পশ্চিম ইউরোপ, মালয়, চিন ও জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চালের বাজার অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। মহামন্দার সময় থেকে থাই চালের বাজারের সংকোচন শুরু হয়েছিল। এর একটি কারণ হল চিন দেশে অরাজকতা, জাপানও থাই চালের আমদানি কমিয়েছিল। ভারত, মালয় ও জাভা থাই চালের আমদানি কমিয়েছিল। থাই চালের নতুন বাজার হল ফিলিপনস, পেরু ও তিউনিশিয়া। থাই চালের রপ্তানি খুব কমেছিল তা নয়, বিশ্বের বাজারে থাই চালের কদর আর আগের মতো ছিল না। রপ্তানি বাড়লেও অন্য পণ্যের সঙ্গে তুলনায় তার মোট রপ্তানি মূল্য কমেছিল। একসময় উন্নতমানের জন্য থাই চাল সুখ্যাত ছিল। চিনা দালালরা উন্নতমানের চালের সঙ্গে নিম্ন মানের চাল ভেজাল দিত, এজন্য আন্তর্জাতিক বাজারে থাই চালের চাহিদা কমে যায়। সরকার থাই চালের উন্নতমান বজায় রাখার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে চালকল স্থাপন করেছিল। বিদেশে উন্নতমানের চাল রপ্তানি বজায় রাখা হয় তবে সরকারি এই উদ্যোগ যে পুরোপুরি সফল হয়েছিল তা বলা যায় না। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও থাইল্যান্ডের চালের মোট উৎপাদন বেড়েছিল যার নাম হল চাল বিপ্লব।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব—পটভূমি

রাজা চুলালংকর্ণ দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর রাজত্বের পর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী

ছিলেন ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত রাজপুত্র ওয়াচিরাবুত (Wachirawut) যিনি ষষ্ঠ রাম হিসেবে সিংহাসন আরোহণ করে ছিলেন। রাজা হিসেবে তার কাজকর্ম ও আচার-আচরণ রাজসভাকে খুশি করতে পারেনি। স্বৈরাচার ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রাজা ষষ্ঠ রাম ছিলেন লেখক ও নাট্যকার, তিনি প্রশাসনে আনন্দ পেতেন না। তিনি সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় করেন রাষ্ট্রীয় উৎসব ও পরিদর্শনের জন্য। শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি ও অপদার্থতা তিনি দূর করতে পারেননি। তিনি মন্ত্রদের পরামর্শ মানতেন না, তরুণ সভাসদ ও স্বার্থান্বেষী তোষামদকারদের কথায় কান দেন। তিনি হারেম তুলে দেন, পাঁচজন রানিকে নিয়ে সংসার করেন। তাঁর আচরণে সৈন্যবাহিনী ক্ষুব্ধ হয় কারণ তিনি তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী ওয়াইল্ড টাইগার কোরের প্রতি অত্যাধিক পক্ষপাতিত্ব দেখান। এদের জন্য তিনি ক্লাব হাউস, ড্রিল হল, পোশাক ও রাগবি ফুটবলের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন কিন্তু তাঁর খামখেয়ালি স্বৈরাচার জনগণের শ্রদ্ধা হারিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯১২ ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দুবার ষড়যন্ত্র করেছিল। রাজ ধর্মনিরপেক্ষ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন আবার তার সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন পশ্চিমি ভাবধারার প্রতিষেধক হিসেবে। তিনি জাতীয়তাবাদের ওপর জোর দেন যা চিনা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।

রাজা ষষ্ঠ রাম বিদেশিদের পরামর্শদাতা হিসেবে রেখেছিলেন, তাদের পরামর্শ মতো চলতেন, তবে বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। তাঁর ব্রিটিশ উপদেষ্টারা অর্থ, বিচার, বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সেচ ব্যবস্থা তদারকি করত। ফরাসি উপদেষ্টারা তাঁকে আইন প্রণয়ন ও আইন সংহিতা তৈরির ব্যাপারে পরামর্শ দিত। জনসেবামূলক প্রকল্পের সঙ্গে তিনি ইতালীয় আর বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মার্কিনিদের যুক্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মান প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। যুদ্ধের শেষে বিদেশি নিয়োগ কমে যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, কারণ সিয়াম ব্রিটিশ ও ফরাসিদের কাছে অনেকখানি অঞ্চল হারিয়েছিল। রাজা নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিলে থাইল্যান্ড বিজয়ী পক্ষে যোগ দেয়। সরকার এ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য ফ্রান্সে পাঠিয়েছিল। এই কারণে শান্তি সম্মেলনে তার একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ রামের মৃত্যু হলে প্রচোথিপক সপ্তম রাম হিসেবে সিংহাসনে বসেন। নতুন রাজা ছিলেন উদারনীতিবাদী, আইন সংহিতার তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে নিজে একপত্নী গ্রহণ করেন। দুঃখজনক হল এই রাজা ছিলেন দুর্বল তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন সেন সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলেন কিন্তু তাঁর হাই কাউন্সিলে শুধু রাজপুত্র ছিলেন, এরা গণতান্ত্রিক সংস্কারে বাধা দিয়েছিল। তাঁর শাসনকালে বিদেশিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির সংশোধন হয়, এতে তাঁর অবদান বিশেষ ছিল না। সপ্তম রাজা অভিজাতদের ক্ষুন্ন করেন, সৈন্যবাহিনী ও আমলাতন্ত্র তার ব্যয় সংকোচন নীতর ফলে ক্ষুন্ন হয়। তিনি দেশের সার্কেলের সংখ্যা ১৮ থেকে কমিয়ে করেন ১০টি অনেক উচ্চপদ তিনি তুলে দেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নিউ সিভিল সার্ভিস আইন প্রবর্তন করেন, রাজপুত্রদের এর আওতার বাইরে রাখা হয়। তিনি রাজার সেবকদের পদ তুলে দেন, এরফলে অভিজাতদের সন্তানরা অনেক সুযোগ-সুবিধা হারিয়েছিল।

তিনি নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলে না। কিন্তু জনগণ উচ্চবর্গের মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা হয়নি। সরকারি দপ্তর ও বিচার ব্যবস্থায় কঠোরভাবে ব্যয় সংকোচ নীতি প্রয়োগ করে তিনি জনপ্রিয়তা হারান।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শাসনের কার্যত অবসান ঘটে। ঐ বছর একদল পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেছিল। সপ্তম রাম দুর্বলভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন, আত্মসমর্পণ করেন। তিনি এদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করেননি বা বিকল্প সংস্কারের প্রস্তাব দেননি। সব ক্ষমতা হারিয়ে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপে চলে যান চক্ষু চিকিৎসার জন্যে। এক বছর পরে এক দশম বর্ষীয় আত্মীয়ের পক্ষে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন, অগণতান্ত্রিক ও সমরতন্ত্রী ব্যবস্থার নিন্দা করেন। এই বালক তখন সুইজারল্যান্ডে ছিল, রাজপ্রতিনিধিরা প্রাসাদের ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেন, রাজতন্ত্র শুধু প্রতীক হিসেবে টিকে ছিল। ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার থাইল্যান্ডের ওপর অসম চুক্তি চাপিয়েছিল, এতে ছিল শুল্কের সুবিধা ও অতিরাষ্ট্রিক অধিকার। ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিরা এর সংশোধনের বিরোধী ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ, মালয়, বর্মা, ইন্দো-চিন, জাভানি ও ভারতীয়রা এই অধিকার দাবি করেছিল। চিনারাও বাদ ছিল না। বেশি দাবি এলে জটিলতা দেখা দেয়। এরা ছিল মাদকের চোরাকারবারী বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, অতিরাষ্ট্রিক অধিকারের জন্য থাই আদালত এদের বিচার করতে পারত না। আইন ও পুলিশ বিধি থেকে এরা অব্যাহতিচেয়েছিল।

থাইল্যান্ডের সীমান্ত অঞ্চলে বর্মার শান উপজাতির লোকেরা বাস করত, এদের ওপর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের আইন প্রয়োগ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এসব শান লোকেরা এবং সীমান্তের লোকেরা ব্রিটিশ প্রজা বলে নিজেদের দাবি করত, এদের বিচারের সময় ব্রিটিশ কনসালের উপস্থিতির প্রয়োজন হত। ব্রিটিশ কনসালের বিচারককে পরামর্শ দিতেন। আবার আদালত থেক ব্রিটিশ নাগরিকের মামলা তুলে নিতে পারতেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের এই আইন সিয়ামে বসবাসকারী সব ব্রিটিশ প্রজাকে বলা হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটেন আশ্রিতদের সুবিধা পাবার অধিকার বাতিল করে দেয়, তাতেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ফরাসিরা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তর লাওসে বসবাসকারী ফরাসি প্রজাদের জন্য তদারকির অধিকার দাবি করেছিল। ফরাসি কনসাল বিচারককে সাহায্য করবেন অথবা আন্তর্জাতিক বিচারালয় ফরাসি প্রজাদের বিচার করবে। সিয়াম এইসব অতিরাষ্ট্রিক অধিকার থেকে সহজে মুক্তি পায়নি, ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাপান ও রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি হলে বলা হয় বিচার বিভাগীয় সংস্কার হলে এই ব্যবস্থা উঠে যাবে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা নতুনদের জন্য শুল্ক সুবিধা বা বিচারের ক্ষেত্রে সুবিধা দাবি করেনি। ফ্রান্সের এশীয় নাগরিকরা সকলে সিয়ামের নাগরিক অধিকার পেয়েছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন চারটি মালয়-সুলতানির ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল, নতুন ব্রিটিশ প্রজার জন্য অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দাবি করা হয়নি। সিয়ামকে ব্রিটিশ বিচারকের বেতন দিতে বলা হয়, রয়াল কোড কমিশন থাই আইনের খসড়া তৈরি করেছিল।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন দেশের সঙ্গে চুক্তিতে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার বাতিল করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিনিময়ে কিছু দাবি করেনি। প্রেসিডেন্ট এই প্রতিশ্রুতি দেন, মার্কিন কনসাল প্রথমদিকে মামলা

প্রত্যাহার করার অধিকার পান তবে বিচারক হিসেবে কাজ করার অধিকার হারান। এসব মামলা সিয়ামের আইন অনুযায়ী বিচার্য বলে বিবেচিত হয়। মার্কিন চুক্তিতে আর্থিক ও শুল্ক সংক্রান্ত সব সুবিধা বাতিল করা হয়। দশ বছর পর যেকোনো পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারবে। এই চুক্তির মডেলে জাপানের সঙ্গে চুক্তি হয়, ব্রিটেনের সঙ্গে সিয়ামের সীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ, আবার বাণিজ্যের এক বড়ো অংশ ছিল ঐ দেশের সঙ্গে। রপ্তানির ৩০ শতাংশ আর আমদানির ৬৭ শতাংশ ছিল ব্রিটেনের হাতে। ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের সুবিধা ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। উপদেষ্টা সাইরে (Sayre) বিদেশের রাজধানীতে গিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে কিছুটা সাফল্য পান, ফ্রান্স ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি করে আইন সংহিতা প্রবর্তিত হবার পাঁচ বছর পর সব সুবিধা ত্যাগ করতে রাজি হয়, শুল্ক সংক্রান্ত সুবিধা তুলে দিতে রাজি হয়। সীমান্ত নিওে ফ্রান্সের সঙ্গে এক চুক্তি হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মেকং নদীর দুই তীরে ২৫ কিমি বেসামরিক অঞ্চল তৈরি করা হয়। জয়েন্ট হাইকমিশন এই অঞ্চল শাসন করবে। এই অঞ্চলে জমি, মৎস্য, সংক্রান্ত সব সমস্যা নিষ্পত্তি করবে এই কমিশন। দুই দেশের অধিবাসীরা নিজ অঞ্চল সব নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ চুক্তি হয়। ব্রিটিশ সরকার আইন সংহিতা প্রবর্তিত হলে সব অতিরাষ্ট্রিক অধিকার বাতিল করতে রাজি হয়। বর্মা ও মালয় সীমাজের প্রজাদের অধিকার বজায় রাখা হয়, বাণিজ্যিক অধিকার ছিল 'সর্বাধিক অনুগৃহীত দেশ্রে' নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কর ধার্য হবে নরমপন্থায়। বস্ত্র ও সুতোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্কের ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও এই হার ছিল। সাইরে আরো ৯টি চুক্তি ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এসব কাজের জন্য তিনি উপাধি পান ফাইয়া কল্যাণ মৈত্রী (Phya Kalyan Miatri)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩০ এবং অন্যান্য দেশ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সব অধিকার ত্যাগ করেছিল।

আকস্মিকভাবে ইউরোপীয় দেশগুলি শ্যামদেশে তাদের সব অধিকার ত্যাগ করেছিল, এর পশ্চাতে ছিল চিনের জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দলের প্রতিষ্ঠা, পিকিং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের আগে সিয়ামে কনসাল রাখেনি। চিন শ্যামদেশে বসবাসকারী ৩ মিলিয়ন চিনার ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেছিল। জাতীয়তাবাদী নানকিং সরকার এই কর্তৃত্ব দাবি করেছিল। জাতীয়তাবাদী নানকিং সরকার এই দাবি তুললে জটিলতা বেড়েছিল, তবে সিয়ামে বসবাসকারী চিনারা জাতীয়তাবাদী থাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তারা অনেকগুলি সুবিধা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল। চিনা বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও ভাষাশিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। চিনে জাতীয়তাবাদীরা এর বিরোধিতা করেছিল। ব্যাংককে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লব হলে তাতে চিনা-থাই দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েছিল। চিনা স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, থাইল্যান্ডে চিনা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। চিনাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ থাই নাগরিকত্ব নয়, তাদের বিশেষ মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছিল, করের ক্ষেত্রে সুবিধা চেয়েছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে রাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা হারিয়েছিল কারণ রাজা সহ পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজন এই ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়েছিল। প্রায় ৮০ জন বিপ্লবী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। এরা ছিল পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্গের মানুষ, রাজকীয় স্বৈরাচার ও অভিজাততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধায় এদের আস্থা ছিল না। বিপ্লবের শুরুতে বিপ্লবীরা

ব্রিটিশ বা ফরাসি হস্তক্ষেপের ভয় পেয়েছিল। এরা ভেবেছিল নিজের বন্ধু রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে এরা ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বিপ্লবীরা এক নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করে নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল এবং পশ্চিমি কায়দার কয়েকটি উদারনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিল। এগুলির মধ্যে ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামাজিক দক্ষতা, সকলের জন্য শিক্ষা, বিভিন্ন স্তরের আয়কর, আমলাতন্ত্রের বেতনে সমতা, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের প্রবেশের ব্যবস্থা, পোস্টাল ব্যয় হ্রাস এবং অপ্রিয় ভূমিকরের উচ্ছেদ। আসলে বিপ্লবীরা প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় ব্যবস্থা চায়নি, তারা সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। বিশ্ব মহামন্দা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল, ঠিক সেই সময়ে কর্তৃত্ববাদী এক নায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। থাইল্যান্ডও আকৃষ্ট হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের জনক হলেন প্রিদি ফানামিয়ং (Pridi Phanamyong) তিনি ফ্রান্সে লেখাপড়া করেন, পেশায় আইনজীবী, জন্মসূত্রে অর্থ-চিনা। ছাত্রাবস্থায় প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি থাইল্যান্ডের অভিজাত দূতের সঙ্গে বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আইন অ্যাকাডেমির শিক্ষক হিসেবে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই কলেজে অনেক তরুণ তাঁর অনুগামী হয়। এই সময়ে মহামন্দা চলেছিল, দেশে ছিল নিদারুণ দারিদ্র্য, সিয়াম এই অর্থনৈতিক দুর্দাার শিকার হয়। চিনারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রিদি দেশের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা বলেন। তিনি মনে করেন সরকার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হলে চিনা প্রভাবের অবসান ঘটবে। সরকার পুঁজি সরবরাহ করবে, কর্মসংস্থান হবে, বিপণনের ব্যবস্থা হবে, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ কমে আসবে। সরকার জমি কিনে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করবে, সরকারি বন্ড বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। দেশবাসী উন্নত পরিষেবা পাবে, শিক্ষার সুযোগ বাড়বে, সমৃদ্ধি আসবে, শুধু জনগণ স্বাধীন উদ্যোগ হারাবে। প্রিভি সরকারের যে পরিকল্পনা করেন তা হল পিপলস পার্টি এক ধরনের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। আইনসভায় শুধু পার্টির সদস্যরা প্রার্থী হতে পারবে। আইনসভা হবে পার্টি নিয়ন্ত্রিত। আইনসভা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। এই প্রেসিডেন্ট ১৪ সদস্য বিশিষ্ট শাসন কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটি মন্ত্রীদের নিয়োগ করবে, আইন প্রয়োগ করবে। প্রিসি সোভিয়েত শাসনতন্ত্র থেকে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে থাইল্যান্ডের সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত হয়। এই সংবিধান প্রিসির সংবিধান থেকে অনেকক্ষেত্রে ছিল স্বতন্ত্র। এই সংবিধান রাজতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার কথা বলেছিল। রাজসভাকে সম্মান দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কতকগুলি গৌণ বিষয় রাজার অনুমোদনের জন্য রাখা হয়। সেইসঙ্গে স্টেট কাউন্সিল থেকে রাজপরিবারের সদস্যদের বাদ দেওয়া হয়। শাসন কমিটির স্থান নিয়েছিল এই স্টেট কাউন্সিল। আইনসভার অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হবেন পরোক্ষ ভোটে, বাকি অর্ধেক নিয়োগ করবে পার্টি। বলা হয় দশ বছরের মধ্যে সব সদস্য নির্বাচিত হবে। কয়েকটি উদারনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিল। এগুলির মধ্যে ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা, সকলের জন্য শিক্ষা, বিভিন্ন স্তরের আয়কর, আমলাতন্ত্রের বেতনে সমতা, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমলাতন্ত্রে প্রবেশের ব্যবস্থা, পোস্টাল ব্যয় হ্রাস এবং অপ্রিয় ভূমিকরের উচ্ছেদ। আসলে বিপ্লবীরা প্রতিনিধিত্বমূল সংসদীয় ব্যবস্থা চায়নি, তারা সরাসরি

সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছিল, ঠিক সেই সময়ে কর্তৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। থাইল্যান্ডও আকৃষ্ট হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের জনক হলেন প্রিদি ফানামিয়ং (Pridi-Phanamyong)। তিনি ফ্রান্সে লেখাপড়া করেন, পেশায় আইনজীবী, জন্মসূত্রে অর্ধ-চিনা। ছাত্রাব্যবস্থায় প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি থাইল্যান্ডের অভিজাত দূতের সঙ্গে বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আইন অ্যাকাডেমির শিক্ষক হিসেবে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই কলেজে অনেক তরুণ তাঁর -অনুগামী হয়। এই সময়ে মহামন্দা চলেছিল, দেশে ছিল নিদারুণ দারিদ্র্য, সিয়াম এই অর্থনৈতিক দুর্দাার শিকার হয়। চিনারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রিসি দেশের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা বলেন। তিনি মনে করেন সরকার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হলে চিনা প্রভাবের অবসান ঘটবে। সরকার পুঁজি সরবরাহ করবে, কর্মসংস্থান হবে, বিপণনের ব্যবস্থা হবে, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ কমে আসবে। সরকার জমি কিনে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করবে, সরকারি বন্ড বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। দেশবাসী উন্নত পরিষেবা পাবে, শিক্ষার সুযোগ বাড়বে, সমৃদ্ধি আসবে, শুধু জনগণ স্বাধীন উদ্যোগ হারাবে। প্রিসি সরকারের যে পরিকল্পনা করেন তা হল পিপলস পার্টি এক ধরনের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। আইনসভায় শুধু পার্টির সদস্যরা প্রার্থী হতে পারবে। আইনসভা হবে পার্টি নিয়ন্ত্রিত। আইনসভা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। এই প্রেসিডেন্ট ১৪ সদস্য বিশিষ্ট শাসন কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটি মন্ত্রীদের নিয়োগ করবে, আইন প্রয়োগ করবে। প্রিসি সোভিয়েত শাসনতন্ত্র থেকে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে থাইল্যান্ডের সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত হয়। এই সংবিধান প্রিসির সংবিধান থেকে অনেকক্ষেত্রে ছিল স্বতন্ত্র। এই সংবিধান রাজতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার কথা বলেছিল। রাজসভাকে সম্মান দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কতকগুলি গৌণ বিষয় রাজার অনুমোদনের জন্য রাখা হয়। সেই সঙ্গে স্টেট কাউন্সিল থেকে রাজপরিবারের সদস্যদের বাদ দেওয়া হয়। শাসন কমিটির স্থান নিয়েছিল এই স্টেট কাউন্সিল। আইনসভাকে অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হবেন পরোক্ষ ভোটে, বাকি অর্ধেক নিয়োগ করবে পার্টি। বলা হয় দশ বছরের মধ্যে সব সদস্য নির্বাচিত হবে। ক্যাবনেট আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে। নতুন বাজেট অনুমোদিত না হলে পুরোনো বাজেট কার্যকর থাকবে। এই সংবিধান অপরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত চলেছিল। ঐ সময় প্রিদির ফ্রি থাই পার্টি সংবিধান সংশোধন করেছিল। প্রিন্স সেনি প্রোমোজ যিনি মার্কিন দেশে সিয়ামের দূত ছিলেন অল্পকালের জন্য বিদেশমন্ত্রী হন।

এই বিপ্লবী সংবিধান রচনা করেন ক্ষমতালিপ্সু বেসামরিক ও সামরিক অফিসাররা। এরা বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিল তাদের ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ আইনানুগ। গণদাবির ওপর ভিত্তি করে সংবিধান রচিত হয়নি। প্রাদেশিক সদস্যরা একে কায়েমি স্বার্থ রক্ষার কৌশল হিসেবে গণ্য করেছিল। জনগণ একে বোঝেনি, এসম্পর্কে উদাসীন ছিল। থাইল্যান্ডের গ্রামের মানুষ ছিল রাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন, এরা রাজাকে শ্রদ্ধা করত। রাজতান্ত্রিক শাসন ও প্রতীকগুলিকে সামাজিক ও জাতীয় গৌরবের বিষয় বলে গণয় করত। রাজা সপ্তম রাম নতুন ব্যবস্থা মেনে নিয়েত রাজি হলে অস্থিরতা কমেছিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। রাজা প্রাসাদে রয়ে যান, ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় প্রতীকগুলি রক্ষিত হয়।

তবে নতুন সংবিধান কোনো স্থায়ী শাসনের ব্যবস্থা করেনি, ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। নতুন শাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

সামরিক শাসনের মধ্যে রক্ষণশীল সামরিক নেতারা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে যান, ভারসাম্য তাদের দিকে ঝুকেছিল। প্রিসি যে বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা দেন রাজভা ও সৈন্যবাহিনী তাকে সাম্যবাদ ভিত্তিক বলে নিন্দা করেছিল। প্রিদি অল্পকালের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যান (জুন, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। সাম্যবাদকে নিষিদ্ধ করা হয়, জনমনে সাম্যবাদ ছিল চিনা ও ভিয়েতনামিদের উগ্রজাতীয়তাবাদ। রাজতন্ত্রীরা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল, এর সুযোগ নিয়ে সৈন্যবাহিনীর কর্নেল লুয়াং পিবুন সংগ্রাম রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসেন। তিনি এই এই রাজতন্ত্রী বিদ্রোহ দমন করেন। চিনা ও ভিয়েতনামি কমিউনিস্টদের দেশ থেকে তাড়িয় দেওয়া হয়। তিরিশের দশকের শেষদিকে এই নিয়ে আর কোনো সমস্যা ছিল না। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রিদিকে সাম্যবাদী মতাদর্শের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তিনি মন্ত্রীসভায় ১৯৩৪-৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বরাষ্ট্র, বিদেশ ও অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদেশিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সব অসম চুক্তি বাতিল করেন। দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ।

১৯৩৩-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের শাসন পরিচালনা করেন বুদ্ধিমান, জনপ্রিয় নেতা ফায়া বাহোল (Phaya Bahol)। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে পদত্যাগ করতে যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন, সকলে সরকারকে সহযোগিতা করে ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত রক্ষণশীল আইনসভা সামরিক গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, সরকার অভিজাত প্রভাব পছন্দ করত না, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উপাধি, ভূমিও ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহার করা হয়। ১ শতাংশ হারে আয়কর ও ২ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক ছিল। সরকার আফিম বিক্রি থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করেছিল, অন্য উৎস হল শুল্ক, আবগারি, লাইসেন্স ও জরিমানা। সরকারের ওপর জাতীয়তাবাদী প্রভাব ছিল, চিনাদের প্রতি কঠোর নীতি নেওয়া হয়। এদের ওপর বৈষম্যমূলক আয়কর, দোকান ও ব্যাংকিং কর বসানো হয়। বিনোদনের ওপর কর বসেছিল। ২৬টি পেশা থেকে চিনাদের বহিষ্কার করা হয়, এসব পেশা ছিল থাইদের জন্য সংরক্ষিত। চিনা ভাষায় পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়। চিনাদের থাই নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি, শর্ত ছিল কঠোর। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের পর জাপানিরা চিনা বিরোধী সরকারি মনোভাবকে মদত দিয়েছিল।

চিনা বিরোধী মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার নিজেই বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়। কাগজ, বস্ত্র, মদ্য তৈরি, চিনি তামাক, তেল ও রেশম শিল্পে সরকার উদ্যোগি ছিল। এসব সংস্থা ভালেভাবে চলেনি কারণ ছিল অদক্ষতা, নিম্নমানের পণ্য ও উৎপাদনের অনিশ্চয়তা। তামাকের মতো ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ সফল হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর রাবার উৎপাদন বেড়েছিল, রেল, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি অনেকখানি সফল হয়। ইউরোপীয় উপদেষ্টাদের সংখ্যা কমানো হয়। থাই জাতীয়তাবাদ ছিল ইতিবাচক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাহায্য নিয়ে আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তারা এক দলীয় শাসনের কথা ভেবেছিল। এরা শিল্পের জাতীয়করণের কথা বলে, জাপানি ও ফ্যাসিস্ট মডেলে তারা কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কথা ভেবেছিল। থাই বিপ্লবীরা

প্রথাগত দলবদ্ধ মানসিকতার পরিচয় রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ নিতে আগ্রহী ছিল, প্রথমে তারা জাপানের পক্ষ নেয়, পরে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করে।

ফায়াবাহোল১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাস্থ্যের কারণে অবসর নেন। সমরতন্ত্রের পক্ষপাতী আইনসভা কর্নেল পিবুন সংগ্রামকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়ে দেয়। প্রিদি ও বেসামরিক ব্যক্তিরা মন্ত্রীসভায় কিছুকালের জন্য রয়ে যান তবে এরা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। পিবুন ছিলেন সৈন্যবাহিনীর এমন এক গোষ্ঠীর যে গোষ্ঠ জাতীয় গৌরব সম্পদ ও প্রাদেশিক গভর্নর পদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। পিবুনকে হত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা হলে সৈন্যবাহিনী রাজনৈতিক শত্রুদের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ঘটনাটি ঘটে। পিবুন নিজে ছিলেন এক সুযোগ সন্ধানী মানুষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী উগ্র জঙ্গিবাদী এবং আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী। তাঁর আধুনিকীকরণের মধ্যে ছিল পারিবারিক নাম গ্রহণ, টুপি পরা, জুতো পরা, অভিনন্দনে হ্যালো বলা এবং পরিশ্রম করা। তিনি থাইল্যান্ডের জাতি ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব ও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে মেলালেন। এই মিশ্রিত রূপই হল দেশপ্রেম। পুরোনো চিনা বিরোধিতার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বিশ্বজনীন থাই আন্দোলন (Pan-Thai) গড়ে তোলেন। সর্বশ্রেণির মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেশের নাম রাখেন থাইল্যান্ড (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। এর অর্থ হল মুয়াং থাই, থাইদের দেশ। সংকীর্ণ অনুদার থাই জাতীয়তাবাদ হল লক্ষ্য। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাপানের প্রভাবে পিবুন হলেন চিনা-বিরোধী, সম্প্রসারণবাদী।

পিবুনের সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসী প্রকল্পের মধ্যে ছিল কাম্বোডিয়ার কয়েকটি সীমান্তবর্তী প্রদেশ অধিকার করা। মেকং অববাহিকা, বর্মার পূর্বদিকের কয়েকটি শান রাজ্য, টেনাসেরিম উপকূল, মালয় সুলতানি রাজ্যগুলি ও পেনাং তার আগ্রাসী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি খানিকটা সহিষ্ণুতা দেখান, তবে ফ্রান্স অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে তিনি ধৈর্য ধরতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৩৯-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পিবুন তাঁর বিদেশি সামরিক উপদেষ্টাদের সরিয়ে দেন, দেশের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সামরিক প্রস্তুতির জন্য বরাদ্দ করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের পতন ঘটলে তিনি প্রকাশ্য পদক্ষেপ নেন, হ্যানয় কতৃপক্ষকে তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের পতন ঘটলে তিনি প্রকাশ্য পদক্ষেপ নে, হ্যানয় কতৃপক্ষকে তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি সংশোধনে বাধ্য করেন। এর অল্পকাল পরে সমগ্র লাওস দাবি করে বসেন, কাম্বোডিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সব অঞ্চল তিনি দাবি করেন। সেই সঙ্গে কাম্বোডিয়ার তিনটি প্রদেশের ওপর তিন দাবি রেখেছিলেন। এই অঞ্চলগুলি তিনি জাপানের মধ্যস্থতায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অধিকার করতে সক্ষম হন। ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে জাপানের দিকে নিয়ে যায়, বিশ্ব রাজনীতির গভীর সংকট তাঁকে প্রভাবিত করেনি। জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য বেড়ে চলেছিল, ইংল্যান্ডের পরেই ছিল জাপানের স্থান। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে লিগ অব নেশনস জাপান সম্পর্কে যে নিন্দাসূচক প্রস্তাব নিয়েছিল সেখানে থাইল্যান্ড ভোটদানে বিরত ছিল। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে লিগে এই প্রভাব উঠেছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর পিবুন জাপানের মডেলে দেশের জন্য একটি তরুণ সংঘ গঠন করেন, তরুণদের জন্য আদর্শ কোড তৈর করেন জাপানের বুশিডো আদর্শো তার নাম দেন Wireattam বা বীরোত্তমা।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জাপানি স্লোগান 'এশিয়া ফর দ্যা এশিয়ানস' থাইল্যান্ডে প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। জাপান আরো প্রচার করেছিল ' গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কো-পস্পারিটি স্ফিয়ার'

ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যের কথা। জাপান এখানে তার পূর্ণ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেছিল, উত্তরে চিয়েংমাই ও দক্ষিণে মালয় রাজ্য সিংগোরেতে উপদ্বীপের উপকূল ভূমিতে আসত। অনেকে জাপানের আগ্রাসন পছন্দ করেনি, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সহমত হয়নি, অনেকে আবার উৎকোচ নিয়েছিল। পিবুন ও তার সামরিক বিভাগের সহকর্মীরা মনে করেন বিশ্বযুদ্ধে জাপান জয়ী হবে। কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ রাজা চুলালংকর্ণের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন আধুনিক থাইল্যান্ড ধারণাকে আঁকড়ে ছিলেন। সামরিক কতৃপক্ষ এই স্বাধীন, সার্বভৌম নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন।

১৬.২.৪.৫ ১৯৩২-৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাই রাজনীতির গতি-প্রকৃতি

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের গোড়ারদিকে থাইল্যান্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিশ্ব মহামন্দার প্রভাব পড়েছিল। দেশের প্রধান পণ্য চালের বাজারে মন্দা, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বিদেশ প্রভাব, বেকারত্ব, বিশ্ববাজরে পণ্যের দামের ওঠানামার সঙ্গে থাইল্যান্ডের বাজারে তার প্রভাব, দেশের মধ্যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর চিনাদের আধিপত্য ছিল, থাইদের প্রভাব তেমন ছিল না। থাইল্যান্ডের উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মনে করে স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও অভিজাতকেন্দ্রিক শাসন জনগণের মঙ্গলসাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও সৈন্যবাহিনর অফিসারদের একাংশ মনে করে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক শাসন, ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ডের স্বৈরাচারী সরকার অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল, বাজেটে ১১ মিলিয়ন টিক্যাল (Tical) ঘাটতি দেখা দেয়। সরকার ব্যয় সংকোচের পথে চলতে বাধ্য হয়। বহু সরকারি কর্মচারী কর্মচ্যুত হন। অন্যদের বেতন ছাঁটাই করতে হয়। সারাদেশে বিক্ষোভ, অসন্তোষ দেখা দেয়। পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা মনে করে পশ্চিমের অবাধ মুক্ত গণতান্ত্রিক অর্থনীতির বরং সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় অর্থনীতি দেশকে মন্দা থেকে রক্ষা করতে পারবে।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন একটি পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনীর অফিসাররা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল দুটি—থাইল্যান্ডের স্বৈরাচারী শাসন দেশের উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি রাজা সপ্তম রামও মনে করেন তাঁর মন্ত্রীসভা দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযোগ হল দেশের অভিজাতরা নানা ধরনের অন্যায় অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। পশ্চিমি শিক্ষিত গোষ্ঠী এই সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্রের বিরোধী ছিল। ফরাসি ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের ভয়ে এই বিপ্লবী গোষ্ঠী নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। তারা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেনি, রাজার ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। এরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য, সকলের জন্য শিক্ষা আয় অনুযায়ী কর, ভূমিকরের উচ্ছেদ প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছিল। তবে উল্লেখ্য ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের নেতারা নিয়মতন্ত্র অপেক্ষা কতৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্রের বেশি পক্ষপাতী ছিল। মহামন্দার ধাক্কায় বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এজন্য তারা একনায়কতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের নেতা ছিলেন প্রিদি প্যানোমায়াং। পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাংককের আইন কলেজের এই অধ্যাপক দেশ শাসনের জন্য একটি নতুন সংবিধানের খসড়া ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করেন। সোভিয়েত ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রিদি তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেন। রাজনীতিতে পার্টি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি সরকারি নেতৃত্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন। সরকার জমি, শিল্প, বাণিজ্য সব অধিগ্রহর করবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনহিতকর কাজ সবকিছুর দায়িত্ব নেবে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয় যা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল, কোনো সংশোধন হয়নি। রাজার পদ অক্ষুন্ন রেখে তাঁকে তিনটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি আইনসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারবেন। কোনো আইন অপছন্দ হলে তিনি ভিটো প্রয়োগ করতে পারবেন। দেশে জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি জরুরি আইন জারি করতে পারবেন। আইনসভার অর্ধেক সদস্য হবে মনোনীত বাকি অর্ধেক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। দশ বছরের মধ্যে আইনসভার সব সদস্য নির্বাচিত হবেন। মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। রাজপুত্ররা আইনসভা সহস্য হতে পারবেন না। চার বছর অন্তর নির্বাচন হবে। ২৩ বছর বয়স্ক সকল শিক্ষিত থাইকে ভোটাধিকার দেওয়া হবে।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী যে সরকার গঠিত হয় তাতে সামরিক বাহিনীর রক্ষশীলদের প্রাধান্য ছিল। এই সরকারের প্রধান হন পায়া মনোপাকর্ন। পায়া বিপ্লবের পুর্বেকার ব্যয় সংকোচের নীতি অনুসরণ করেন, এতে সকলে অসন্তুষ্ট হন, ক্ষোভ বেড়েছিল। দেশে কমিউনিস্ট ও চিনাদের কার্যকলাপ বেড়ে চলেছিল। প্রিদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন এই অভিযোগে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। দমন-পীড়ন শুরু হয়ে যায়, পায়া ক্রমাগত একনায়কতন্ত্রী মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তার মন্ত্রীসভার চারজন সাময়িক বিভাগীয় মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। পায়া মনোপাকর্ন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই রাজনৈতিক ঘটনাটিও ছিল এক ধরনের অভ্যুত্থান। ১৯৩৩-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ফায়া বাহোল (P'ya Bahol)। এই সময় প্রিদি দেশে ফিরে আসেন, তাঁর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। প্রিদি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ইতিমধ্যে রাজবংশের লোকেরা সৈন্যবাহিনীর একাংশকে হাত করে একটি অভুত্থান ব্যর্থ করে দেন।

বাহোল সরকার দেশের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। সরকারের সামরিক ও বেসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেন। প্রিসি বাহোল সরকারের স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তার নেতৃত্বে থাইল্যান্ড বিদেশিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সব অসম চুক্তি বাতিল করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৩ ও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের দু'বার সাধারণ নির্বাচন হয়, নির্বাচনের পর বাহোল মন্ত্রীসভা গঠন করতে সক্ষম হন। তবে এই সরকারের ওপর সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য বাড়তে থাকে। এই মন্ত্রীসভা অভিজাতদের বংশানুক্রমিক সব উপাধি বাতিল করে দিয়েছিল। সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল শুল্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও লাইসেন্স। চিনাদের ওপর বৈষম্যমূলক কর স্থাপন করা হয়। ছাব্বিশটি পেশা থেকে চিনাদের উৎখাত করে এগুলি থাইদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয়ে চিনা ভাষার পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। থাইল্যান্ডে জাপানি প্রভাব বৃদ্ধি পেলে চিনা বিরোধী মনোভাবও বাড়তে থাকে।

বাহোলসরকার কাগজ, রেশম, বস্ত্র, তেল, রাবার, জাহাজ পরিবহন শিল্পে ব্যাপক অংশগ্রহ করে। বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পে থাইদের অংশীদারী এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। রাবার ও তামাক শিল্প ছাড়া আর সব শিল্পে পরিচালনগত অদক্ষতা দেখা দেয়। উৎপাদিত পণ্য ছিল নিম্নমানের। রেল, ডাক, তার ও বিদ্যুৎ শিল্পে বিদেশি উপদেষ্টারা রয়ে যায় তবে তাদের সংখ্যা কমেছিল। পশ্চিমি শিক্ষা, শাসন ও আইন থাইল্যান্ডের আধুনিকতা এনেছিল। তিরিশের দশক থেকে একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীয়করণ ইত্যাদি অত্যাধুনিক ধ্যান-ধারণাগুলি থাইদের প্রভাবিত করে।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাস্থ্যের কারণে বাহোল পদত্যাগ করলে সেনাপতি পিবুন প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি থাইল্যান্ডের নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের স্রষ্টা। দেশের নাম পাল্টে রাখেন থাইল্যানহ। তার শাসনকালে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিমি আদব-কায়দা, জুতো, টুপি, পোশাক প্রবর্তন করেন। কড়াকড়ি করে ব্যবস্থা নেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করেন, অনেক সামাজিক কুপ্রথা যেমন পান খাওয়া তুলে দেন। নবজাতীয়তাবাদের গঠনে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেন। নবজাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল বৌদ্ধধর্ম, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি। অবৌদ্ধদের জন্য সরকারি চাকরির দুরজা বন্ধ হয়ে যায়। একজন থাই বিদেশি পত্নী গ্রহণ করতে পারবেন না। পিবুন ছিলেন চিনা বিরোধী থাই জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। থাই জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি সর্বজনীন থাই আন্দোলন (Pan-Thai movement) শুরু করে দেন। এর লক্ষ্য ছিল থাইদের মধ্যে সব বিরোধ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলি ছিল আগ্রাসী পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের শিকার। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে থাই সরকার উগ্র আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। জাপানের সঙ্গে থাইল্যান্ডের বাণিজ্য বেড়ে চলেছিল। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে চিনাদের দেশ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়। জাপানের মডেলে পিবুন দেশে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলেন। এদের উগ্র জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়। জাপানি বুশিডোর মডেলে তিনি বীরোত্তম (Wirattam) নামে এক নতুন আচরণ ও নৈতিকবিধি রচনা করেন। এই বীরোত্তম ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, বৌদ্ধধর্ম ও আচরণের এক অদ্ভুত মিশ্রণ।

বৈদেশিক নীতিতে থাইল্যান্ডের বন্ধু ছিল জাপান। এই বন্ধুত্বের ভিত হল বৌদ্ধধর্ম ও চিনা বিদ্বেষ। পশ্চিমি দেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে সব সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী পিবুনের দৃঢ় ধারণা হয় জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হতে চলেছে। জাপান যুদ্ধে যোগ দিলেও ফ্রান্স পরাজিত হলে থাইল্যান্ড হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। বিরুদ্ধে তেমন চাপ দেওয়া হয়নি কিন্তু ফ্রান্সের ওপর চাপ দিয়ে জাপানি মধ্যস্থতায় পিবুন ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের বেশ কিছু অঞ্চল লাভ করেন। ১৯৩৯-৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পিবুন জাতীয় আয়ের এক-তৃথয়াংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ করেন। জাপানকে খুশি করার জন্য ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পিবুন ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। আবার ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের গতি জাপানের বিরুদ্ধে চলে গেলে তিনি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। মিত্র শক্তিবর্গের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন যুদ্ধ শেষ হল থাইল্যান্ড ছিল মিত্র শক্তিবর্গের বন্ধু।

বিশ্ব মহামন্দার পটভূমিকায় থাইল্যান্ডে রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটনা ঘটে। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল, গণতান্ত্রিক শাসন নামমাত্র টিকে ছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেন, তার

এক শিশু আত্মীয়কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দেশে রাজনৈতিক সংকট ছিল, এই সংকট নিরসনের জন্য সামরিক নেতৃত্ব উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ ধরেছিল, জাপানের সঙ্গে সহযোগিতায় চিন বিরোধিতায় নেমেছিল। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে লিগে বিতর্ক শুরু হলে থাইল্যান্ড জাপানকে সমর্থন করেছিল। ১৯৩২-১৯৪৫ সময়কালে থাইল্যান্ডের একনায়কতন্ত্রী শাসন ছিল ইউরোপের বৃহত্তর ফ্যাসিবাদের এক ক্ষুদ্র এশীয় সংস্করণ।

১৬.২.৫.৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর থাইল্যান্ডের রাজনীতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলির মধ্যে থাইল্যান্ড হল একমাত্র দেশ যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ছিল সবচেয়ে কম। এজন্য যুদ্ধোত্তরকালে পুনর্গঠনের কাজও ছিল সবচেয়ে কম। শাসকশ্রেণির রয়ে যায় অপরিবর্তিত। অন্যান্য দেশ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় আন্দোলন করেছিল। থাইল্যান্ড বরাবর স্বাধীন ছিল, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সেদেশে এক বড়ো ধরনের রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটনা ঘটে যায়। ক্ষমতা দখল করেছিল সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও পেশাদার মানুষ। পুরোনো অভিজাততান্ত্রিক শাসকশ্রেণি ক্ষমতাচ্যুত হয়। ত্রিশের দশকে এখানে উগ্র জাতীয়তাবাদী পশ্চিম বিরোধী প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের দশকে দেখা গিয়েছিল। এজন্য থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ছিল না। সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তন ঘটেনি। যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে তিনটি গোষ্ঠী ছিল, এরা বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা ভোগ করেছিল। সামরিক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন পিবুন সংগ্রাম (১৯৪৮-৫৭ খ্রিস্টাব্দ), সরিত থানারাত (১৯৫৮-৬৩ খ্রিস্টাব্দ), থানম কীর্তিকাচর্ন ও পারফাত চারুসাথিয়েন (১৯৬৩-৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন প্রিদি ফ্যানোমাইং (১৯৪৪-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। তৃতীয় গোষ্ঠী ক্ষুদ্র হলেও ছিল প্রভাবশালী। এদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পুরাতনপন্থী ও রাজতন্ত্ররা এদের নেতৃত্ব দেন খুয়াং আফাহং ও সোনি প্রোমোজ।

ঐতিহ্যগতভাবে থাইল্যান্ড ছিল চিনের এক করদ রাজ্য, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দেশটি ব্রিটিশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে থাইল্যান্ড পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে জাপানকে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল, বিনিময়ে পশ্চিম কম্বোডিয়া, বর্মা ও মালয়ে অনেকখানি অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। জাপানের পরাজয় শুরু হলে জাপান বিরোধী নেতা প্রিদিকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানো হয়। সরে যান জাপানপন্থী নেতা পিবুন সংগ্রাম। জাপান সম্পূর্ণ পরাস্ত হলে থাইল্যান্ড উপলব্ধি করে জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভুল হয়েছিল। কাম্বোডিয়া, বর্মা ও মালয়ের অধিকৃত অঞ্চল ফেরত দেয়। থাইল্যান্ড উপলব্ধি করেছিল এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ, এখানে নতুন বৃহৎ শক্তি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে যায়।

জাপানের পতনের পর ফ্রি থাই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতা সেনি প্রামোজকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানো হয়। তিনি মিত্রপক্ষ ও বর্ষীয়ান নেতা প্রিসির মনোনীত ছিলেন, মিত্রপক্ষ সেনির সঙ্গে যুদ্ধোত্তর বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করেছিল। থাইল্যান্ড যুদ্ধের সময় অধিকৃত সব অঞ্চল ত্যাগ করেছিল, যুদ্ধের

পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। থাইল্যান্ড এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক হয়, লিগের সদস্য হয়। একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়, নিম্নকক্ষের সব সদস্য নির্বাচিত, সেনেট সদস্যদের এরাই হল নির্বাচনের অধিকারী। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনবছর দেশে প্রবল রাজনৈতিক অশান্তি ছিল, এই সময়ে অন্তত ন'টি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল, এতে সাধারণ মানুষের কোনো উদ্বেগ ছিল না কারণ মুষ্টিমেয় শাসকবর্গ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মেতেছিল। যুদ্ধের পর মুক্ত পরিবেশ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জুগিয়েছিল।

তবে সব দলই ক্ষমতা দখলের জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কনসস্টিটিউশন ফ্রন্ট ও কো-অপারেশনস পার্টি মিলিতভাবে প্রামোজকে সমর্থন করেছিল, তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর বিরোধী নেতা ছিলেন খুয়াং আফাইং। তিনি এই সময়ে ডেমোক্রেটিক দলের নেতা ছিলেন। দুই মাসের মধ্যে কিশোর রাজা আনন্দর রহস্যজনক অবস্থায় মৃত্যু হলে এই সরকারের পতন হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলেছিল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা চলেছিল দেশে ছিল প্রচণ্ড দুর্নীতি, অপদার্থতা ও নৈরাজ্য, সৈন্যবাহিনী ছিল ঐক্যবদ্ধ তবে এর মধ্যে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের পর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পিবুন সংগ্রাম উপলব্ধি করেন দেশবাসী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চায়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনী অভ্যুস্থানের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। এরা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেনি। এরা খোয়াং আফাইং সরকারকে সমর্থন করেছিল, সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক প্রিদি দেশ থেকে পালিয়ে যান, তাঁকে রাজার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেনি। সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয় পুলিশ বিভাগের প্রধান জেনারেল ফাও স্রিয়ানন ও সৈন্যবাহিনর প্রধান জেনারেল সরিত থানারাত। এদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য ছিল না, এর সুযোগ নিয়ে পিবুন অভ্যুত্থানকারীদের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। তিনি হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। অল্পদিনের বেসামরিক শাসনের পর থাইল্যান্ডের আবার সাকরিক শাসনাধীনে চলে যায়। সেই সময় ও পরে মনে হয়েছিল সামরিক বাহিনী শুধু দেশটাকে শান করতে পারে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পর প্রায় পাঁচিশ বছর থাইল্যান্ড সামরিক শাসনাধীনে ছিল। গবেষকরা এজন্য চারটি কারণকে দায়ী করেছেন— রাজতন্ত্র ছিল ঐক্যকামী শক্তি, আমলাতন্ত্র ছিল অরাজনৈতিক ও অনুগত, ঐক্যবদ্ধ সৈন্যবাহিনী এবং মার্কিন সমর্থক চিন বিরোধী বিদেশনীতি। রাজা ভূমিবল আদুল্যাদেজ সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করেন।

থাইল্যান্ডের জাতীয় রাজনীতিতে রাজতন্ত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা ছিল না, তবে এর প্রভাব ছিল বিশাল, দেশের সর্বত্র ও সব শ্রেণির ওপর তার প্রভাব ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক, তাকে দেশবাসী দেবতার অংশ বলে মনে করত। এটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজা ভূমিবল ও রানি সিরিকিত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, জনগণের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতেন। প্রধানমন্ত্রী সারিত ও থানোম রাজা ও রানির প্রতিকৃতি সারাদেশে বণ্টন করে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেন। এরা হলেন জাতয় ঐক্যের

প্রতীক। রাজ শক্তি রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না, তবে তাঁর মর্যাদাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা হত। রাজতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের চেয়ে থাই রাজা অনেকবেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। সরকারকে প্রয়োজনবোধে করলে রাজা পরামর্শ দিতেন, হস্তক্ষেপ করতেন। ১৯৪৮-৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাই সরকার পরিচালনা করেন তিনজন সামরিক নেতা— পিবুন সংগ্রাম, ফাও শ্রিয়ানন ও সারিত থানারাত। পিবুন চিনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি চিনা অভিবাসন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। চিনে দূতাবাস বন্ধ করে দেশের চিনা স্কুল ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চিনে গণপ্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে সরকার চিনাদের নাগরিকত্ব দানের ব্যাপারে কঠোর হয়, উচ্চহারে ফি ধার্য করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে থাই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। থাই ও চিনাদের মিশ্র বিবাহকে উৎসাহ দেওয়া হয়, এদে দুই সম্প্রদায় উপকৃত হয়। এরফলে থাই নেতারা ধনী চিনা পরিবারে বিবাহ করে সম্পদশালী হন, অপরদিকে চিনারা লাইসেন্স ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের অধিকারী হয়।

পঞ্চাশের দশকে থাই বিদেশনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কমিউনিস্ট ভীতি। উত্তরের মিও উপজাতিদের চিন সাহায্য দিত। লাওসের মধ্য দিয়ে আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল, ভিয়েতনাম ও পাথেট লাও উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের বিদ্রোহী উপজাতিদের সাহায্য দিত। সব মিলিয়ে কমিউনিস্ট ভীতি তৈরি হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বেষ্টনি নীতি (policy of containment) ঘোষণা করলে থাইল্যান্ডের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হয়। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের বিক্ষুব্ধদের জাতীয় মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। সেদিকে লক্ষ না রেখে শাসকগোষ্ঠী দেশের বিক্ষুব্ধদের দমনের প্রয়াস চলিয়েছিল। থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। দেশটি সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশনের(SEATO) সদস্য হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গী হয় থাইল্যান্ড। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই ব্যবস্থা অটুট ছিল।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে পিবুনের সঙ্গে সারিত থানারাতের বিরোধ বাধে। জনসমর্থন আদায়ের জন্য তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন। তার দল জাতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তবে ভোটারদের ভয় দেখানো হয়, ভোটে কারচুপিও ছিল। পুলিশ প্রধান ফাও এব্যাপারে পিবুনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সারিত নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও লেজের ছাত্ররা তাকে সমর্থন করেছিল। এরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন দাবি করেছিল। প্রত্যুত্তরে পিবুন তাকে আর্থিক চাপের মধ্যে ফেলে দেন। প্রত্যেক সামরিক অফিসার ও আমলাদের তিনি বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন বলেন। সারিত অনেক সংস্থায় যুক্ত ছিলেন ফলে তাকে দুর্বল করা ছিল পিবুনের লক্ষ্য, তখন ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সারিত একটি রক্তপাতহীন অভুত্থানের মাধ্যমে পিবুনকে প্রথমে কাম্বোডিয়া, পরে জাপানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। ফাও সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান, সেখানকার ব্যাংকে তাঁর অর্থ গচ্ছিত ছিল। পিবুনের জন্য কেউ শোক করেনি যদিও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে তিনি ছিলেন নায়ক। শাসনের দশ বছরে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন। তিনি এক ভয়ংকর দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের প্রধান ছিলেন। সারিতের শাসন অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বড়ো রকমের

পরিবর্তন ঘটায়নি। দুর্নীতি বেড়েছিল, মার্কিন সাহায্য শাসকগোষ্ঠী অত্মসাৎ করেছিল। সারিত ছয় বছর সরকারের প্রধান ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) তার মনোনীত উত্তরাধিকার মার্শাল থানম কীর্তিকাচর্ন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সারিত-থানম শাসন থাইল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিয়ে যায়। এই সময়কালে থাইল্যান্ড এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিল। মার্কিন সৈন্যরা এখানে ছুটি কাটাতে এসে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করত। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাস্ক-থানাত চুক্তি ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মিলিটারি কন্টিনজেন্সি প্ল্যান দুই দেশের সম্পর্কে উন্নতি ঘটিয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থাইল্যান্ড ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বন্ধু। অনিচ্ছাসত্ত্বেও থাইল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেশে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি বানানোর অনুমতি দিয়েছিল। উদর্ন ও সাত্তাহিপে এরকম ঘাঁটি বানিয়ে মার্কিন বোমারু বিমান ভিয়েতনামের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। থাইল্যান্ডে ৫০,০০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। থাইল্যান্ড ১২,০০০ সৈন্য ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছি। আরো কয়েক হাজার পাঠানো হয় লাওস রণাঙ্গনে। থাইল্যান্ড এভাবে বিরাট রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছিল। শুধু চিন ও ভিয়েতনাম নয়, তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধী ছিল তাদের বিশ্বাস হারিয়েছিল। আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দুই ধরনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। চিন ও ভিয়েতনাম দেশের বিদ্রোহীদের সাহায্য দিত। দেশের জাতীয়তাবাদীরা মার্কিন সৈন্যের উপস্তিতির বিরোধিতায় নেমেছিল। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে চিন থাই ইনডিপেনডেন্স আন্দোলন শুরু করে দেয়, আর থাই পেট্রিয়টিক আন্দোলন সরকারের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। চিন লাওস-থাই সীমান্তে সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। উত্তর ভিয়েতনাম উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের থাই বিরোধী উপজাতি আন্দোলন মদত দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের দমন কার জন্য বেশি করে মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিল। ভিয়েতনাম সেটা পাঠাতে দেরী করেছিল। ১৯৬৮ খ্রীঃ ৩১শে মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন, হ্যানয়ের সঙ্গে সমঝোতার ঘোষণা করেন। থাই প্রধানমন্ত্রী সহ কয়েকজন দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্সকে নিয়ে কমিউনিষ্ট বিরোধী জোট গড়ে তোলেন। বিদেশমন্ত্রী থানাত খোমান ও তার সহকর্মীরা আরো বিকল্পের সন্ধান করেন কারণ তাদের ধারণা হয় অল্পকালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ড ছেড়ে চলে যাবে। থাইল্যান্ড এখানে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা কমাতে শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর প্রয়াস শুরু হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, চিনের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি ঘটানোর জন্য কমিটি গঠন করা হয়। পরের বছর থাইল্যান্ড আসিয়ানের সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই অঞ্চলের জন্য দাবি করেছিল শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা। এসব সতর্কতা সত্ত্বেও থাইল্যান্ড বিস্মিত হয় যখন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পিকিং সফরের কথা ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল মার্কিন নীতিতে আমুল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। সামরিক নেতাদের প্রতিক্রিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর দুই বছর পূর্বে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কীর্তিকাচর্ন সরকার নতুন সংবিধান প্রবর্তন করেছিল। আইনসভা নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। যদিও সামরিক শাসন ছিল জনগণ গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। স্বাধীন পরিবেশ তৈরি হয়, নেতারা সরকারের সমলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিরোধীরা সরকারি বাজেটের সমালোচনা করেছিল।

চিন সম্পর্কে মার্কিন নীতির পরিবর্তন হলে থাইল্যান্ডের ওপর তার দুই রকমের প্রভাব পড়েছিল। থাইরা তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে নীতি পরিবর্তন ঘটানোর বিরূপ সমালোচনা করেছিল। অনেক রাষ্ট্র নেতা সামরিক নেতাদের দূরদৃষ্টির অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। থাইল্যান্ড নিজেই চিনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারত। এই অভিযোগ সবটাই সঠিক নয়। সামকির নেতারা চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিল। বিদেশমন্ত্রী থানাত খোমান বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলোচনার মন্থর গতির সমালোচনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলোচনার মন্থর গতির সমালোচনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে চিন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হলে কয়েকজন বিরোধী নেতা চিনকে অভিনন্দন জানায়, পিকিং সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পার্লামেন্ট ও প্রেসে সামরিক নেতাদের সমালোচনা হয়। সামরিক নেতারা উদারনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অসহিষ্ণু হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী থানম কীর্তিকাচর্ন বিদেশমন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন, সংবিধান বাতিল ও আইনসভা ভেঙে দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রত্যাহত হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়, সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। বিদেশনীতর ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়। দেশে ৫০,০০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়, বিমানবন্দর পাঁচ থেকে বাড়িয়ে করা হয় সাত। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। থাইল্যান্ড তার দেশে মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল। দেশের মধ্যে এর বিরুদ্ধে প্রবল আপতি উঠেছিল, এজন্য সরকার আমেরিকার কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করতে পেরেছিল। প্যারিস চুক্তিতে উত্তর ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া ও লাওস থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়নি। আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে সরে গেলে থাই নেতারা ভিয়েতনামের আক্রমনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তারা মার্কিন, রুশ ও চিনা নেতাদের ভিয়েতনামকে বিরত করার কথা বলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়া ও লাওস আক্রমণ করবে।

কীর্তিকাচর্ন সরকার উপলব্ধি করতে পারেনি সামরকি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়ে চলেছে। থানম কীর্তিকাচর্ন ও তার ডেপুটি প্রপাস চারুসাথিয়েনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে অনেক দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ জন ছাত্রকে বন্দি করা হয় কারণ তারা সংবিধান দাবি করে পুস্তিকা বণ্টন করেছিল। দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্র ও নাগরিক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পুলিশ গুলি চালায়, রাস্তায় ট্যাঙ্ক নেমেছিল, ১০০ জন মারা যায়, কয়েকশো আহত হয়। এই রকম সংকটজনক মুহূর্তে রাজা হস্তক্ষেপ করে থানম কীর্তিকাচর্ন ও প্রপাস চারুসাথিয়েনের বহিষ্কার করেন এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় সান্যা থাম্মাসাতকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। সেই সময়ে সান্যা থাম্মাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন, ছাত্রদের আস্থাভাজন। এই ঘটনার সঙ্গে থাইল্যান্ডের পঁচিশ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। সেই প্রবল আবেগঘন মুহূর্তে ছাত্র ও সাধারণ মানুষ একটি সৎ, দক্ষ সরকার কামনা করেছিল যা দেশের মানুষের উন্নতি করবে। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা তিন বছর চলেছিল, চারটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। একটি মন্ত্রীসভা মাত্র এক সপ্তাহ টিকেছিল। আইনসভার সদস্য ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সংবিদান তৈরি করতে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করেন। সান্যা

ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তিনি উগ্রপন্থী সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। ছাত্ররা ন্যাশনাল স্টুডেন্ট সেন্টার অব থাইল্যান্ড গঠন করে বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এদের অনেকে ছিলেন নরমপন্থী, কেউ কমিউনিস্ট। এরা ভূমি বন্দোবস্ত শহরের বর্ধমান খাজনা ও দূনীর্তির সমালোচনা করতে থাকে। এদের বড়ো কৃতিত্ব হল কার্মাস ফেডারেশন অব থাইল্যান্ড গঠন। এই সংগঠনের উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় ছিল।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ৪২টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। সেনি প্রমোজ যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তা আটদিন টিকেছিল। তিনটি দক্ষিণপন্থী দল সোসাল অ্যাকশন পার্টি গঠন করে সেনির ভ্রাতা কুকরিত প্রামোজক প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছিল। পরের এক বছর তিনি অসীম বুদ্ধিমত্তায় সরকার চালিয়েছিলেন, বামপন্থী ছাত্র ও দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়াই করতেহয়। সামরিক অফিসার ও আমলারা দুটি সংস্থা গঠন করে ক্ষমতা ফিরে পাবার প্রয়াস শুরু করেছিল। এই দুটি সংস্থা হল নবপণ (New Resolve)ও রেড গার্ড, অবশ্যই দক্ষিণ-পন্থীদের সংস্থা। নবপণকেন্দ্র, প্রদেশ ও জেলাস্তরে আমলা, সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের সহায়তা নিয়েছিল। কমিউনিস্ট বিরোধী নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী এদের সাহায্য করেছিল। এদের ধারণা হয় ছাত্ররা সকলে কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে জাতি, ধর্ম ও রাজতন্ত্রকে রক্ষার দায়িত্ব এরা নিয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। দক্ষিণপন্থীরা রেড গার্ডে যোগ দিয়ে বামপন্থীদের প্রতিরোধ করেছিল। এরা ফার্মার্স ফেডারেশনের নেতাদের অনেককে হত্যা করেছিল। এরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন আক্রমণ করেছিল, থাম্মাসাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পত্তি নষ্ট করেছিল। সোসালিস্ট পার্টির তরুণ সেক্রেটারি জেনারেল বুনসানং থুন্যোথায়নকে হত্যা করেছিল। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নবপণ ও রেড গার্ড দেশের মধ্যে নৈরাজ্য, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বামপন্থীরা পরাস্ত হয়, প্রধানমন্ত্রী পরাস্ত হন, রক্ষণশীলরা জয়ী হয়, সেনি প্রামোজ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সমর্থন দিয়েছিল সৈন্যবাহিনী পুলিশ ও আমলাতন্ত্র। জনগণের হাতে ক্ষমতার দাবি পরাস্ত হয়, আইনশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার দাবি জয়ী হয়।

দেশনেতা ও জনগণ বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন আশা করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন শক্তির ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিদেশনীতির প্রয়োজন হয়। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বহু মেরুর উপস্থিতি লক্ষ করেন। সোভিয়েত-মার্কিন দাঁতাতের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র দেশগুলির সুযোগ কমেছিল। আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে বলে তিনি মনে করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে থানাত সাউথ-ইস্ট এশিয়ায় পৃথক সত্তার কথা বলেন। আঞ্চলিক সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের কথা বলেন, আমেরিকা আর বিশ্ব পুলিশম্যান হিসেবে থাকবে না, তাই থাই কুটনীতিবিদরা এক শক্তিকে আর এক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ভারসাম্য রক্ষার রাজনীতিতে আস্থা রেখেছিল। চিনকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড প্রথমে এক পিংপং দল চিনে পাঠিয়েছিল। পরে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল। হ্যানয়ের সঙ্গে তারা থাইল্যান্ডে বসবাসকারী ৭০ হাজার ভিয়েতনামি নাগরিকদের দেশে ফেরা নিয়ে আলোচনা করে। এরপর থাইল্যান্ডে সামরিক সরকারের পতন ঘটে, লাওস, কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনস্টরা ক্ষমতা দখল করেছিল। দেশে জাতীয়তাবাদ

শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদীরা দেশে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি অত্যন্ত অবমাননাকর বলে মনে করেছিল। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে থাইরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল না।

থাইরা মার্কিন সৈন্যের অপসারণ দাবি করেছিল। প্রাক্তন CIA প্রধানকে ব্যাংককে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করলে আপত্তি ওঠে। CIA দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল হয়, সরকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে বলেছিল। থাইল্যান্ড থেকে মার্কিন বোমারু বিমান কিছুটা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুকরিত প্রামোজ প্রধানমন্ত্রী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সব সৈন্য ও বিমানবহর সরিয়ে নিতে বলেছিল। আমেরিকা অল্পংখ্যক বিমান ও সৈন্য রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল, থাই সরকার রাজি হয়নি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী সেনি প্রামোজ আমেরিকাকে কোনো সুবিধা দিতে রাজি হননি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মার্কিন সৈন্য থাইল্যান্ড ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কুকরিত প্রামোজ পিকিং-এর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিদেশমন্ত্রী চাটিচায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ অঞ্চল গড়ার কাজে মন দেন। এখানে সংশ্লিষ্ট সব দেশের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুকরিত পিকিং সফর করেন, চিনা নাগরিকদের জন্য কিছু সুবিধা দেন।

উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সহজ ছিল না। হ্যানয় স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়, লাওস ও কাম্পুচিয়ার ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। থাইল্যান্ড মনে করে হ্যানয় হল তার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। উত্তর ভিয়েতনাম দাবি করেছিল মার্কিন সৈন্য থাইল্যান্ড না ছাড়লে আলোচনা হবেনা। এজন্য থাইল্যান্ড আমেরিকাকে থাইল্যান্ড ত্যাগ করতে বলে। মার্কিন সৈন্য থাইল্যান্ড ত্যাগ করলে থাইল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীকে ভিয়েতনাম আহ্বান করতে রাজী হয়েছিল। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দুই দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়।

চিন ও ভিয়েতনামের সাথে আলোচনা দক্ষিণপন্থী ও সামরিক অফিসাররা থাইল্যান্ডের পক্ষে অস্মানজনক গণ্য করেছিল। একটি কমিউনিস্ট বিরোধী সৈন্যবাহিনীর গোষ্ঠী তোষণের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। জেনারেল থানিন ক্রাভি চিয়েন ছিলেন এর নেতা। হ্যানয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। অল্পকাল ??? ক্রিয়াংসাফ চমন ক্ষমতা দখল করেন (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। ভিয়েতনামের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৬.২.৫.৭— সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Describe traditional Tahi economy with referece to Rice Revolution.

২) What do you know about Thai politics before 1945?

৩) What changes were introduced in Thai politics after world war II?

পর্যায়-৩

ঔপনিবেশিক ভিয়েতনাম

১৬.৩.৬.১—সূচনা
১৬.৩.৬.২—ভিয়েতনামের ঐক্য
১৬.৩.৬.৩—ইন্দো চীনে ফরাসী উপনিবেশ
১৬.৩.৬.৪—পল ডুমারের সংস্কার
১৬.৩.৬.৫—ইন্দো চীনে ফরাসী উপনিবেশের প্রভাব
১৬.৩.৬.৬—ভিয়েতনামের দেশ-জাতি ও জনবিন্যাস
১৬.৩.৬.৭—নমুনা প্রশ্ন

১৬.৩.৬.১—সূচনা

বর্তমানে পর্যায়ে আমরা ঔপনিবেশিক ভিয়েতনাম ও তার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি তাদের মানুষজন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৬.৩.৬.২ ভিয়েতনামের ঐক্য

অষ্টাদশ শতক জুড়ে ভিয়েতনাম ছিল বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ও গৃহযুদ্ধে অশান্ত। ভিয়েতনামের মধ্যে তিনটি ভূখণ্ড রয়েছে—টংকিং (হ্যানয়), আনাম (হুয়ে) ল কোচিন-চিন (সায়গন)। দুটি রাজবংশ দীর্ঘকাল ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, বিদেশিরা ইংরেজ ডাচ, ফরাসি ও পর্তুগিজরা বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিল। মিশনারিরা বাণিজ্য করত। উত্তরে ছিল ট্রিন রাজবংশ, দক্ষিণে নগুয়েন। থাইল্যান্ড ও মায়ানমার এই অঞ্চলে সম্প্রসারণের প্রয়াস চালাত। এজন্য রাজনৈতিক পরিস্তিতি আরো জটিল ও অশান্ত হয়ে উঠত। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে নগুয়েন রাজবংশ প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। কাম্বোডিয়া নিয়ে থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। নগুয়েন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাই বাহিনীর লড়াই হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এই সময় এক শক্তিশালী বিদ্রোহ হয়। অষ্টাদশ শতকের এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল টেসন (Tay-son) জেলা। তিন নগুয়েন ভ্রাতারা নগুয়েন ভ্যান নাক, নগুয়েন ভ্যান লু ও নগুয়েন ভ্যান হুয়ে এই টেসন বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই নগুয়েন ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজপরিবারের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এই টেসন বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয়, দেশের বহু সাধারণ মানুষ, কৃষক ও কারিগর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নগুয়েন নাক সরকারি নগুয়েন বাহিনীকে পরাস্ত করেন। দক্ষিণে এরা আরো উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল, সায়গন দখল করেছিল। সাধারণ মানুষ রাজা ও মান্ডারিনদের শাসন পছন্দ করত না। ট্রিন ও নগুয়েন উভয়ে একই ধরনের শাসন স্থাপন করেছিল। সাধারণ মানুষ এই দুই রাজবংশের বিরোধিতা করেছিল। টেসন নেতাদের শাসন ছিল অনেকখানি ন্যায়পরায়ণ ও নরমপন্থী। তাদের শত্রু নগুয়েন ও ট্রিনদের চেয়ে এরা এক্ষেত্রে এগিয়েছিল। এদের অনুগামীদের মধ্যে ছিল বণিক, কৃষক, বৌদ্ধ ও তাও ধর্মাবলম্বীরা এবং মই উপজাতির পাহাড়ি মানুষজন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এদের সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ পর্যটক লিখেছেন যে এদের শাসক হিসেবে সুনাম হয়, শাসনের ক্ষেত্রে এবং ??নীতিন অনুসরণ করেছিল, এদের শাসন ছিল জনগণের কল্যাণকামী

টেসন বিদ্রোহের মধ্যে উত্থান-পতন অবশ্যই ছিল। এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সাফল্য লাভ করেনি। টেসন বিদ্রোহীরা ১৭৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে সায়গন আক্রমণ করেছিল, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে এরা উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে মধ্যাঞ্চলে হুয়েতে ট্রিন বাহিনীকে পরাস্ত করে ঐ অঞ্চল দখল করেছিল। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে টেসন বাহিনী সায়গনে ফিরে এসে নগুয়েন রাজপরিবারকে ধ্বংস করেছিল। এই রাজবংশের পঞ্চদশবর্ষীয় এক কিশোর নগুয়েন আন (Nguyen Anh) শুধু জীবিত ছিলেন। এই রাজপুত্র উপসাগর তীরে হাতিয়েন শহরে আশ্রয় নেয়। এখানে তখন এক ফরাসি ধর্মযাজক পিগনুদ্য বেহেন (Pigneau de Behaine) বাস করতেন। এরা শহর ছেড়ে সিয়াম উপসাগরের কূলে এক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে এই কিশোর শাসকের পক্ষ নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসিরা ভিয়েতনামে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পথা ভেবেছিল, তবে আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এখানে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্স এই সময় আমেরিকার পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ রত ছিল।

হাতিয়েন ঘাঁটি থেকে অভিযান চালিয়ে নগুয়েন আন তার হৃত অঞ্চলের কতকাংশ পুনর্দখল করতে

সক্ষম হন। দ্বিতীয় অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ফরাসি বন্ধু, এরা সায়গনে ফিরে আসেন। তবে টেসন বিদ্রোহীরা এই শহর পুনরায় দখল করেছিল, নগুয়েন আন ও তার সঙ্গীকে বিতাড়িত করেছিল। এরা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরে শেষে থাইল্যান্ডে আশ্রয় নেন। থাইল্যান্ডের সাহায্য নিয়ে নগুয়েন আন ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। এক সময়ে মনে হয়েছিল নগুয়েন রাজপরিবারের আশা শেষ হয়ে গেছে। এইরকম হতাশাজনক অবস্থায় পিগুনু দ্য বেহেন ফরাসি সাহায্য নেবার কথা ভাবেন। ইনি ছিলেন ধর্মপ্রচারক, মিশন এস্ট্রেঞ্জারের সদস্য (Missions Estrangeres) ইনি নগুয়েন আনের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন, প্যারিসে গিয়ে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করেন। পণ্ডিচেরিতে ছিলেন। এদের অনুপস্থিতির সময়েও ভিয়েতনামে ঘটনা ঘটে চলেছিল, টেসন বিদ্রোহীরা উত্তরে ট্রিনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল। টেসন বিদ্রোহীরা উত্তরে হ্যানয় দখল করেছিল। ট্রিনরা এদের বাধা দিয়ে চলেছিল, চিন এদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছিল। এই অঞ্চলের সার্বভৌম শক্তি ছিল চিন। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ টেসন বিদ্রোহীরা এদের উত্তরের সীমান্তের অপর পারে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ চিন সাগরে এরা নৌবহর দিয়ে আঘাত হেনেছিল। ট্রেন ও টেসনদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই নগুয়েন আনের কাছে নতুন সুযোগ এনে দেয়। তিনি থাইল্যান্ডকে মায়ানমারের বিরুদ্ধে সাহায্য দিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করেন। থাই বাহিনীর সাহায্য নিয়ে তিনি মেকং অববাহিকায় তাঁর অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নগুয়েন আন অরক্ষিত সায়গন দখল করে নেন। এর অল্পকাল পরে ফরাসি সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। তিনি এই সাহায্য নিয়ে নিজের অবস্থানকে আরো মজবুত করে নেন। ফরাসি সরকার নগুয়েন আনকে সাহায্য পাঠায়নি, বেসরকারি ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য এসেছিল। পন্ডিচেরির গভর্নর কনওয়ে এই অভিযানে অংশ নিতে চাননি, পিগুনু এতে মোটেও দমেননি। তিনি সংগৃহীত অর্থ থেকে চারখানি জাহাজ ভর্তি সমরসম্ভার, গোলন্দাজ বাহিনীর সম্ভার ও কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবী ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। দুইখানি জাহাজ ও পন্ডিচেরির একখানি পাহারাদার জাহাজ নিয়ে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সায়গনে এসে পৌঁছান।

ফরাসি সাহায্য নগুয়েন আনের ক্ষমতালাভ কতখানি সহায়ক হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। উল্লেখ্য এইসময় টেসন বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এসেছিল, টেসন ভ্রাতাদের জীবিত দুই ভ্রাত ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। ফরাসি সাহায্য অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল। নগুয়েন আন ফ্রান্স থেকে পেয়েছিলেন কামান ও গোলাবারুদ। নৌবহর গঠনের কাজে ফরাসিরা মূল্যবান সাহায্য দিয়েছিল। এই নৌবহর নিয়ে যুদ্ধকে উত্তরে নিয়ে গিয়ে শেষ করা সম্ভব হয়। ফরাসি সাহায্য এলে নগুয়েনের দলের লোকেরা উজ্জীবিত হয়, তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। যদিও আরো সাহায্যের যে আশা জেগেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। যে সময় নগুয়েন বাহিনীর নৌবহর ও গোলন্দাজ বাহিনীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা পেতে তাদের কোনা অসুবিধা হয়নি। এরা সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, দুর্গ নির্মাণে সহায়তা দিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে অন্তত ২০ জন অভিজ্ঞ লোক ছিল, এরা অন্য স্বেচ্ছাসেবীদের পরিচালনা করেছিল। পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধবিগ্রহ অংশ নিয়ে খ্যাতি লাভ করেছিল। ফরাসিদের দক্ষতা এদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তারা এক অধীনস্থ রাজার হয়ে লড়াই করে সমগ্র ভিয়েতনামকে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। নগুয়েন আনের আগে কোনো রাজা

সমগ্র ভিয়েতনামকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেননি। একথা ঠিক ফরাসি সৈন্যসংখ্যা কখনও ৩৬০-এর বেশি ছিল না, এদের মধ্যে ১০০ জন ছিল স্বেচ্ছাসেবী। এদের সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল। ফরাসি নৌসেনারা সংখ্যায় ছিল ১২৫ জন। ম্যাকাও ও অন্যান্যদের বন্দর থেকে আরো কিছু নাবিক এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। অন্তত তিনজন অভিজ্ঞ নৌঅফিসার ছিল, নৌঅধক্ষ ডেওট (Dayot) ভিয়েতনামের নৌবহর গঠন করেন, পরিচালনা করেন। অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার ছিলেন পুঁইমাত্তেল যিনি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেন, দুর্গ গড়ে তোলেন। বিখ্যাত ফরাসি সমরবিশারদ ভবার মডেলে এখানে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি কাজও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। পিগনু ছিলেন সংগঠক, প্রশাসক ও বিদেশমন্ত্রী নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে নজুয়েন সংগ্রাম করলেও জয়লাভ সহজে হয়নি। টেসনদের নৌবহর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয়, প্রধান দুর্গ দখলের জন্য দু'বার অভিযান চালাতে হয়। ১৮০১ খ্রীঃ হুয়ে অধিকৃত হয়, ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানয়, এটি ছিল টংকিং-এর প্রধান নগর। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বিজয়ী রাজপুত্র নিজেকে ভিয়েতনামের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বস্ত বন্ধু পিগনুর মৃত্যুর পর তিনি সায়গনে তাঁর সমাধি নির্মাণ করে শ্রদ্ধা জানান।

১৬-৩.৫.১ ইন্দো চীনে ফরাসী উপনিবেশ

সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতনামের যোগাযোগ ছিল, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে ফরাস ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই সময়কার ফরাসি সরকার ধর্ম প্রচারের কাজকে উৎসাহ দিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষে ভিয়েতনামে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ২.৫ লক্ষ, এরা সকলে উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির লোক। রাজা জিয়ালং-এর সঙ্গে ধর্মযাজক রেহেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাসত্ত্বেও ভিয়েতনামের শাসকেরা ধর্মপ্রচারক মিশনারিদের পছন্দ করত না। পিগনু জিয়ালুং-এর শিশুপুত্রকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিলে রাজপরিবার ক্ষুণ্ণ হয়। ভিয়েতনামে খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমতে থাকে। উনিশ শতকের বিশের দশকে মিশনারি ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। পরবর্তী রাজা মিন মাং, হিউ ট্রি ও টুডুক এই অত্যাচার চালিয়ে যান। চিনাদের মিশনারি ও বিদেশি অভিজ্ঞতা থেকে ভিয়েতনামের রাজসভা বিশেষ কিছু শেখেনি। ক্যাথলিকদের প্রতি বিদ্বেষ বেড়েছিল, সব বিদেশিকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। এর একটি কারণ হল মিশনারিরা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করত। এই মিশনারিদের সঙ্গে কোচিন চিনের আধা-স্বাধীন বিদ্রোহী গভর্নর ল্য ভ্যান ডুয়েটের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই গর্ভনর মিল মাং-এর সিংহাসন আরোহণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল (১৮২০ খ্রিস্টাব্দ)। এইজন্য রাজা মিশনারিদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এইজন্য মিন মাং ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। মিশনারিরা ছিল রাজার প্রধান শত্রুর বন্ধু এবং এক বিদেশি শক্তির প্রতিনিধি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মিন মাং মিশনারিদের ভিয়েতনামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। আট বছর পর এক কঠোরতম আদেশ জারি করেচার্চগুলি ধ্বংস করে দেন এবং ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য যোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। আক্ষরিক অর্থে এই আদেশ কার্যকর হয়নি তবে অনেক ক্যাথলিক ও মিশনারি নিহত হন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনাম রাজ চিনাদের মতো তাঁর বন্দরের বিদেশি জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন।

যদিও ভিয়েতনাম চিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল ফরাসিরা চিনে ইংরেজদের সাফল্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এরা ধর্মযাজকদের ওপর অত্যাচারকে ভিয়েতনামকে উন্মুক্ত করার কাজে ব্যবহার করেছিল। ফরাসিরা নানা অজুহাতে চিন ভিয়েতনামের আইন-কানুন অমান্য করত। এসব দেশে মিশনারিদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ধর্মান্তকরণ পছন্দ করতা না। ক্যাডি লিখেছেন যে দূরপ্রাচ্যে ফরাসিদের বাণিজ্যরক্ষার প্রশ্ন ছিল না, এখানে ফরাসি নৌবহরের অফিসারদের কাজ ছিল মিশনারিদের রক্ষা করা। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে দক্ষিণ চিন সাগরে ফরাসি নৌবহর ও বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত বেড়েছিল কারণ চিনে পাঁচটি বন্দর বিদেশিদের কাছে উন্মুক্ত করেছিল। এই নৌবহর ভিয়েতনামে হস্তেক্ষেপ করে বন্দি মিশনারিদের মুক্ত করেছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি জাহাজ তুরেন (ভানাং) বন্দ দুই সপ্তাহ অবরোধ করে রেখে বোমাবর্ষণ করেছিল। তারা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যাজক লেফেভরের মুক্তি দাব করেছিল। ক্যাথলিকদের প্রতি অত্যাচার ও বোমা বর্ষণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। বুটিংগার মন্তব্য করেছেন যে সত্তর মিনিটে ফরাসি কামান যত লোকের প্রাণ নিয়েছিল দুশো বছরের সরকারি নির্যাতন তা পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক ডাইজেস্ট পত্রিকায় লেখা হয় গত একশো বছরে ক্ষুদ্র ভিয়েতনাম এক লক্ষ শহিদের প্রাণ নিয়েছে, আর কোনো দেশ এত হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি। এই হিসেবে অনুযায়ী ৭০ মিনিটের ফরাসি বোমাবর্ষণ দশ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়েছিল। এরকম ঘটনা আণবিক যুদ্ধের আগে সম্ভব ছিল না। বিদেশিরা অবশ্যই অতিশয়োক্তি করেছেন, সরকারি আদেশ ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে অবশ্যই ফারাক থাকত। টুডুকের শাসনকালে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়, মিশনারিদের সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করতে বলা হয়, তখনও ভিয়েতনামি ক্যাথলিক নগুয়েন টুংটো উচ্চ আদালতের অফিসার ছিলেন। তিনি একজন মিশনারির সঙ্গে ইউরোপে গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করেন। একশো বিদেশ গ্রন্থ নিয়ে দেশে ফেরেন, তিনি সম্রাট টুডুককে সংস্কার প্রবতন করার পরামর্শ দেন।

ক্যাথলিকদের ওপর নির্যাতনের রিপোর্ট পেয়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তার মেক্সিকো ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কোচিন-চিনে হস্তক্ষেপের কথা ভাবেন। এই যুগে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় শক্তি ও গৌরব লাভ করা। চার্চ, বণিক শিল্পপতিরা এর প্রধান উদ্যোক্তা। ফরাসি বণিকরা ভিয়েতনামের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ এখান থেকে চিনের অভ্যন্তরে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, এখানে লাভজনক বাণিজ্যের সম্ভাবনাও ছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে চিনের ৫টি বন্দর উন্মুক্ত হয়, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আরো এগারোটি বন্দর। এসব বন্দর সব বিদেশি বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল। ফরাসি বণিকরা কোচিন-চিনের সায়গনে ঘাঁটি বানিয়ে এখানে সিঙ্গাপুর ও হংকং-এর মতো একটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এখান থেকে দক্ষিণ চিন সাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সুবিধা ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও স্পেন যৌথভাবে ভিয়েতনামের মিশনারিদের রক্ষার জন্য অভিযান পাঠিয়েছিল। ঐ বছর দুইজন যাজক, একজন ফরাসি, একজন স্পেনীয় নিহত হন। স্পেনীয়রা অভিযান থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, কারণ ভিয়েতনাম সরকার নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফরাসিরা তিনবছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে রাজা টুডুকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিল। এই সন্ধির শর্তগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফরাসিরা কোচিন-চিনে তিনটি প্রদেশ লাভ করেছিল, এর মধ্যে সায়গন ছিল। অন্য শর্ত হল এই দেশের কোনো অঞ্চল ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো বিদেশিকে হস্তান্তর করা যাবে

না। ফরাসিরা মনে করে আনামে তাদের প্রটেক্টরেট স্থাপিত হয়েছে। রাজা ফরাসিদে ৪ মিলিয়ন পিয়াসাত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন, আনামের তিনটি বন্দর তিনি ফরাসিদের কাছে উন্মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই চুক্তিতে ছিল ভবিষ্যত খ্রিস্টানদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হবে। এই চুক্তি অনুযায়ী ফরাসিরা মেকং নদীতে নৌচলাচলের অধিকার লাভ করেছিল। সমগ্র মেকং অববাহিকার ওপর ফরাসিদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ঐতিহাসিকরা ফরাসি বিবরণের ওপর নির্ভর করে কোচিন-চিনে ফরাসি অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দিয়েছেন। ভিয়েতনামের বিপর্যয়ের কারণ হল অদক্ষ শাসন। মেকং বদ্বীপ অঞ্চলে তারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়। যদি তাই হয় তবে ভিয়েতনামিরা কীভাবে অনেকবেশি শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সাড়ে তিনবছর ধরে লড়াই করেছিল তার উত্তর পাওয়া যায় না। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনাম সম্রাট ফরাসিদের দাবি মেনে নেন কারণ তিনি উত্তর ভিয়েতনামে পুরোনো লে রাজবংশের এক রাজপুত্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন বার্নার্ড ফল ও লে থান খোই। ফল মনে করে ফরাসিরা কোচিন-চিনে সফল হল কারণ এখানে ভিয়েতনামিরা ছিল বিদেশি, এখানে তাদের শাসন সম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অভিয়েতনামিদের সমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলি নিরাপদ ছিল না। এজন্য এখানকার অভিয়েতনামিরা ফরাসিদের বাধা দেয়নি। তবে ফরাসরা উত্তরদিকে অগ্রসর হলে কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। ভিয়েতনামের এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লে থাস খোই মনে করেন মান্ডারিনরা রাজার কাছ থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বাস্তব পরিস্থিত গোপন করে রেখেছিল। বৈদেশিক ক্ষেত্রে সংকটের কথা রাজাকে জানাতে হয়নি। লে মনে করেন এদের অন্ধ দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ভিয়েতনামের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

এই বিষয়ে সন্দেহ নেই মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মান্ডারিনদের নিয়োগ করা হত, এরা শাসন করত, যুদ্ধ পরিচালনা করত। এরা উত্তর ও মধ্য ভিয়েতনাম আরো দু'দশক ধরে শাসন করেছিল। ফরাসিরা ধীরে ধীরে সমগ্র এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। এখানকার মান্ডারিনরা, চিনে মতো বিশ্বাস করত কনফুসিয়াসের দর্শনে সব সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে তারা গুরুত্ব দেয়নি। এইরকম পরিস্থিতিতে একটি আধুনিক আগ্রাসী পশ্চিমি শক্তির কাছে ভিয়েতনামের পতন ছিল সময়ের অপেক্ষা। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনাম-ফরাসি চুক্তির এক শর্ত ছিল মেকং নদীতে নৌপরিবহনের অধিকার। এই নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম চিন। খ্রিস্টানদের রক্ষা করা নয়, এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল আসল লক্ষ্য। কোচিন-চিনে সব ভিয়েতনামি খ্রিস্টান বাস করত না। চুক্তির চার বছরের মধ্যে ফ্রান্সের বেসরকারি ভৌগোলিক সংস্থা দুইজন নৌঅফিসারকে (ফ্রান্সিস গার্নিয়ের ও দুদার্ত দ্য লাগ্রি) মেকং নদী জরিপের জন্য পাঠিয়েছিল। এই সংস্থার প্রধান ছলেন ফ্রান্সের নৌবিষয়ক মন্ত্রী চাসেলুপ ল্যাম্বার্ট। তিনি ফরাসি বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। এই ভৌগোলিক সংস্থাটি বণিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করত। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের চেম্বার্স অব কমার্সের সহযোগিতায় 'এ সোসাইটি ফর কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি' স্থাপিত হয়। এরা সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনার জন্য উদ্যোগ নেয়, অর্থ দেয়।

ফ্রান্সিস গার্নিয়ের এক রাজতন্ত্রী পরিবারে জন্মেছিলেন, তিনি ডুপ্লেক্সের মতো প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমতুল্য সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন। তিনি নিজের আর্থিক লাভের আশায় সাম্রাজ্যিক স্বপ্ন দেখেননি, তিনি তাঁর দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। তিনি মনে করেন তিনি একজন ঈশ্বর আদিষ্ট ব্যক্তি যার কাজ হল ফ্রান্সের ক্ষীয়মান গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ফ্রান্সের প্রকৃতি নির্দিষ্ট ভাগ (manifest destiny) প্রতিষ্ঠার তিনি হলেন কারিগর। সায়গনের কাছে চো-লনের গভর্নর ছিলেন তিনি চার বছর। তিনি স্বেচ্ছায় লাগ্রির মেকং অভিযানে যোগ দিতে রাজি হন। মেকং নদীর খোঁজে বেরিয়ে লাগ্রি-গার্নিয়ের অভিযান (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) কম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই সময় কাম্বোডিয়ার প্রচণ্ড রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। এখানকার রাজারা ইউরোপীয়দের কাছে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে, তারাই একমাত্র মহাদেশীয় রাজ্য যে বিদেশিদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল।এর আগে পঞ্চাশ বছর থেকে কাম্বোডিয়া তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল। ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে আঙ্করের পতনের পর থেকে খামের রাজারা ছিলেন থাইল্যান্ডের সামন্তরাজ্য, আয়ুথিয়া ও ব্যাংকক সার্বভৌম। সপ্তদশ শতকের বৈদেশিক থেকে হয়ে কেন্দ্রিক নগুয়েন রাজপরিবার এই রাজ্যটির ওপর চাপ দিয়ে চলেছিল, কোচিন-চিন এর অঞ্চল দখল করেছিল। এদের কাছ থেকে কর ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দাবি করেছিল। এখানে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রায়ই দন্দ্ব হত প্রতিদ্বন্দ্বীরা থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সমর্থন কামনা করত। এরা সাহায্যের বিনিময়ে কাম্বোডিয়ার একাংশ অধিকার করে নিত। বলা যায় দুর্বল খমের রাজারা থাইল্যান্ড বা ভিয়েতনামের রাজবংশের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হত।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম নিজেদের সংহতি সাধনের কাজে মন দিয়েছিল। কাম্বোডিয়া বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার মাটিতে শক্তি পরীক্ষায় নামবে। এজন্য ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাম্বোডিয়া দুই দেশকে কর দিত। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নমপেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন রাজা আংচান ও তাঁর ভ্রাত আংডুং।এদের পক্ষ নিয়ে থাই ও ভিয়েতনামি সৈন্য কাম্বোডিয়ার প্রবেশ করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে থাই রাজা দ্বিতীয় রাম রক্তাক্ত সংঘাত পরিহার করে সৈন্য সরিয়ে নেন তবে কাম্বোডিয়ার দুটি প্রদেশ মেলুপ্রে ও স্টুং টেঙ্গ তিনি অধিকার করে নেন। তবে তার আশামতো ভিয়েতনাম সৈন্য সরিয়ে নেয়নি। দ্বিতীয় রামের উত্তরাধিকারী তৃতীয় রাম অত সহনশীল ছিলেন না, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাম্বোডিয়া আক্রমণ করেন, রাজা আং চান সাহায্যের জন্য ভিয়েতনামে যান। ভিয়েতনামের সম্রাট মিন মাং রাজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যু হলে ভিয়েতনাম কার্যত কাম্বোডিয়াকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। রাজকন্যা আংমে-কে পুতুল শাসক হিসেবে খমের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। এই সময়ে কাম্বোডিয়াতে ৩৩টি প্রদেশ ছিল, এরা সব ভিয়েতনামের অংশ হয়ে যায়।

১৮৪১-৪৫ সময়কাল কাম্বোডিয়ার ইতিহাস সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ। খমের জাতির লোকেরা ভিয়েতনাম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। এরা নির্বাসিত রাজপুত্র থাইপন্থী আং ডং-কে রাজা বলে ঘোষণা করে দেয়। আরো একবার থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার মাটিতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনগণ দারুণ সমস্যায় পড়ে । সম্ভবত এই সময় কাম্বোডিয়ার লোকপ্রবাদ ‘হাতিতে হাতিতে’ যুদ্ধ হয়, পিপীলিকা মারা যায়’ সৃষ্টি হয়। কাম্বোডিয়া শান্তি চেয়েছিল, দুটি শক্তিশালী প্রতিবেশী যৌথভাবে এই

দেশের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে খমের রাজারা যে যৌথ সার্বভৌমত্বের ধারণা সৃষ্টি করেন তা কার্যত স্বীকৃতি লাভ করে। শক্তিশালী দুই প্রতিবেশিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কাম্বুচিয়া, অনেকখানি অঞ্চল হারিয়েছিল। নিজের রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজা আং ডং (Ang Duong) ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে একখানি চিঠি লিখে তার সাহায্য ও হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করেননি ফ্রান্স, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্প্রসারণ আগ্রহী। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় ফ্রান্স কোচিন-চিনে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কোচিন-চিন জয় করে ফ্রান্স দাবি করেছিল কাম্বোডিয়ায় তারা হল ভিয়েতনামের উত্তরাধিকারী। পরের বছর ফ্রান্স কাম্বোডিয়ায় ফরাসি প্রটেক্টরেট স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কাম্বোডিয়ার রাজা নরোদম (আং ডং-এর পুত্র) এই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ আগস্ট ফ্রান্স ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির একটি অসম্পূর্ণ দিক ছিল, নরোদম তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হননি। থাই রাজা দাবি করেন তাঁর অধীনস্থ রাজার অভিষেক তিনি সম্পন্ন করবেন। থাইল্যান্ড দাবি করেছিল কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার অধিকার তার রয়েছে। ফরাসিরা নরোদমকে ব্যাংকক যেতে দেয়নি। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই নাটক শেষ হয়, থাইল্যান্ড নরোদমের অভিষেক মেনে নেয়, চুক্তিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যার তখনও শেষ হয়নি, থাইরা কূটনীতিতে খুব দক্ষ। ফরাসিদের জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। থাইল্যান্ড এক গোপন চুক্তি দেখিয়ে দাবি করেছিল কাম্বোডিয়া থাই সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে। কাম্বোডিয়ার রাজা হলেন তাঁদের প্রাদেশিক গভর্নর। ফরাসি-থাই-আলোচনার মধ্যে দিয়ে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি গড়ে ওঠে। থাই সরকার কাম্বোডিয়ার ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি ত্যাগ করতে রাজি হয়, বিনিময়ে কাম্বোডিয়ার দুটি প্রদেশ বাট্টামবাং ও সিয়েমরিপ তাকে ছেড়ে দিতে হয়। এই দুটি প্রদেশ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে থাই অধিকারে ছিল। নরোদমের আপত্তি সত্ত্বেও ফরাসিরা কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই দুটি প্রদেশ বিশ শতকের তিনবার হাতবদল হয়, বর্তমান কাম্বোডিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

মেকং নদীতে লাগ্রি-গার্নিয়ের অভিযান জানয়েছিল দক্ষিণ চিনে বাণিজ্য পথ রূপে উপযুক্ত নয়। অনেকগুলি জলপ্রপাত ও উত্তর-পূর্ব কাম্বোডিয়ার ও লাওসেরগজী মেকংকে অনাব্য করে তুলেছে। মেকং-এর উচ্চঅববাহিকায় ল্যাগ্রি প্রাণ হারান, গার্নিয়ের এই পথে উনান পৌছে যান, হ্যানকাও হয়ে সায়গন ফিরে আসেন। গার্নিয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে রেড রিভার পথ অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। তিনি উনানে গিয়ে দেখেন বেশিরভাগ দক্ষিণ চিনের বাণিজ্য—রেশম চা, ও বস্ত্র—ক্যান্টন পরিহার করে টংকিং-এ প্রবেশ করে। রেড রিভার পথ শুধু বাণিজ্য সহায়ক হবে না, ফরাসি সভ্যতার বিস্তার ঘটবে। টংকিং বদ্বীপ ও তার বাইরে এই সভ্যতার বিস্তার ঘটানো সম্ভব। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়া যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয় ঘটলে ইন্দো-চিনে তাদের সব পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফ্রান্সের মার্কেন্টাইলিস্ট ও সায়গনের ফরাসিরা ইন্দো-চিনে ফরাসি অধিকারের সম্প্রসারণ দাবি করেছিল। চিনের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের সম্প্রসারণেণ জন্য ইন্দো-চিনের ওপর নির্ভর করা যায়। তিনজন ব্যক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এরা হলেন কোচিন-চিনের গভর্নর নৌঅধ্যক্ষ মারি-জুলস দুপ্রে, ফ্রান্সিস গার্নিয়ের ও বণিক-অভিযাত্রী জ্যঁ দুপুই (Dupuis)।

দুপুই ছিলেন ১৮৫৮ থেকে প্রাচ্যের লোক, অস্ত্র ব্যবসায়ী, দক্ষ তবে অসৎ। চিন সরকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিদ্রোহ দমনের জন্য এর কাছ থেকে অস্ত্র কিনত। দুপুই পরে উনান ও টংকিং-এর মধ্যে লবণ ও খানিজ দ্রব্যের ব্যবসা শুরু করেন। ভিতেয়নামের মান্ডারিনদের একচেটিয়া বাণিজ্যের তিনি ক্ষতি করেন ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গার্নিয়েরের সঙ্গে রেড নদী বরাবর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এরা টংকিংকে ফরাসি শস্যাগার করে দক্ষিণ চিনের খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনের অধিকার লাভে আগ্রহী ছিলেন। চার বছর পর তিনি প্যারিসে গিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রীর সমর্থন আদায় করেন। তিনি জাহাজ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হন। তিন কোচিন-চিনের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। দুপুই-এর টংকিং অভিযানের এক দশক আগে থেকে সেখানে ভিয়েতনাম সম্রাটের অধিকার শিথিল হয়ে পড়েছিল। টংকিং বদ্বীপ অঞ্চলে নগুয়েন বিরোধী বিদ্রোহ দমক করতে সরকারের পাঁচ বছর লেগে যায়। চিন-ভিয়েতনাম সীমান্তের পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্রোহ ও নৈরাজ্য চলেছিল বেশ কিছুকাল। চিনা দস্যু ও বিদ্রোহীরা যারা দক্ষিণ চিনের মুসলিম বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল দেশ ছেড়ে ভিয়েতনামের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে লুটপাট চালিয়েছিল। এইরকম দুটি সংগঠিত দস্যু দল হল ব্ল্যাক ফ্লাগ ও ইয়েলো ফ্লাগ। এরা উচ্চ রেড নদী অবাহিকায় বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। এইরকম স্থানীয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জ্যঁ দুপুই-এর কাজকর্ম আরো সমস্যা তৈরী করেছিল। তিনি রেড নদী ও উনানের মধ্যে পথ তৈরী করে তার অবৈধ লবন, খনিজ ও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির ব্যবসা চালাতে চেয়েছিল। ফরাসিরা তাকে কিছু গোপন সাহায্য দিয়েছিল, সাপুই-এর সঙ্গে ১৫০ জন সশস্ত্র সঙ্গী ছিল তাদের পাঠিয়েছিল উনান প্রদেশের চিনা গভর্নর।

দুপুই-এর সঙ্গে স্থানীয় ভিয়েতনামিদের সংঘর্ষ হল হ্যানয় এলাকায়। মান্ডারিনদের দুপুই-এর বাণিজ্য পছন্দ করেনি কারণ এগুলি তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। তারা ফরাসি অভিযাত্রীকে রেড নদী বরাবর উচ্চ উপত্যকায় যেতে বাধা দিয়েছিল তিনি এই পথে চিনে লবণ ও অস্ত্র পাঠাতে চেয়েছিলেন। দুপুই হ্যানয়ের একাংশ অধিকার করে গভর্নর দুপ্রেকে ভিয়েতনামি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। ভিয়েতনাম সম্রাট টুডুকে এদের মধ্যেকার গোপন আঁতাতের খবর জানতেন না। তিনি দুপ্রেকে ফরাসি অভিযাত্রীকে হ্যানয় থেকে বিতাড়নের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দুপ্রে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টংকিং-এর অশান্ত পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র নৌবহর ও কিছু স্থলসৈন্য পাঠলেন মধ্যস্থতার অজুহাতে। এর নেতৃত্বে ছিলেন গার্নিয়ের তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দুপুইকে হ্যানয় থেকে বিতাড়িত করা। গার্নিয়ের নৌবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বণিকদের অর্থে চিনের জন্য বাণিজ্য পথের সন্ধান করেন। সাংহাইতে অবস্থানকালে দুপ্রে তাকে টংকিং অভিযান পরিচালনা করতে বলেন। দুপ্রে কোচিন-চিনের গভর্নর পদ গ্রহণ করা পর থেকে (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে) দক্ষিণ চিনের সঙ্গে বাণিজ্য পথ খোলার কথা ভাবেন। কোচিন-চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। প্যারিসের নৌ ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেন। ভিয়েতনাম সরকার সম্পর্কে ধৈর্যশীল হতে বলেন। দুপ্রে ও গার্নিয়ের এই পরিস্থিতিতে টংকিং অধিকারের পরিকল্পনা করেন।

চল্লিশজন দক্ষ অনুচর নিয়ে গার্নিয়ের হ্যানয় আসেন, সম্রাটকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি

দুপুইকে টংকিং থেকে বিতাড়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি বরং দুপুই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্থানীয় মান্ডারিনদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন। তিনি এককভাবে ঘোষণা করেন রেড নদী দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলবে। তিনি শুল্ক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর শুল্কের হার কমিয়ে দেন। তার যুক্তি হল সভ্যতা ও ফ্রান্সের স্বার্থে এছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। তিনি হ্যানয়ে দুর্গ আক্রমণ করে দখল করেন, রেড নদীর ধারে সব বড়ো শহর দখল করেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে টংকিং, হাইফং ও নিনবিন ফরাসিদের দখলে চলে যায়। দুপুই হ্যানয় অধিকার করে বসে থাকেন। মান্ডারিনরা তাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হারিয়েছিল। তারা গার্নিয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এক গোষ্ঠীকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। গার্নিয়ের ঘোষণা করেন তিনি ব্ল্যাক ফ্লাগ বিরোধী। এরা গ্রামাঞ্চলে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। মান্ডারিনরা এদের উৎসাহ দিয়েছিল। এদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে গার্নিয়ের মৃত্যু হয়। গার্নিয়ের ও দুপ্রে নিজেরাই এসব কাজ করেছিল, না ফরাসি সরকারের গুপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী এসব করা হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। গার্নিয়েরের মৃত্যু জন্য ও পয়ারিসের কাছে ছিল এক দুঃসংবাদ। ফ্রান্স সরকারিভাবে গার্নিয়েরের সৈন্যকে সমর্থন করেনি, দুপুইকে টংকিং ত্যাগ করে চলে আসার নির্দেশ দিয়েছিল। ভিয়েতনামের সম্রাট টুডুকের সঙ্গে ফ্রান্স একটি শান্তিচুক্তি করেছিল। এসব সত্ত্বেও বলা যায় গার্নিয়েরের স্বপ্ন অনেকখানি সফল হয়। রেড নদীকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। টংকিং-এর তিনটি বন্দর উন্মুক্ত করা হয়, এসব বন্দর ফরাসি কনসাল ও রক্ষি রাখার ব্যবস্থা হয়। গার্নিয়েরের মৃত্যু অন্তত দশ বছর ফরাসি সম্প্রসারণ ব্যাহত করেছিল।

গার্নিয়েরের মৃত্যু ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিলতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি পরাসি গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্প্রসারণ চেয়েছিল। ফ্রান্সের প্রয়োজন ছিল বাজার, উপনিবেশ ও জাতীয় মর্যাদার। এশিয়া ও আফ্রিকার সেই সম্ভাবনা ছিল। ভৌগোলিক সংস্থার সদস্যরা উপনিবেশ চেয়েছিল। উপনিবেশ বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হবে, পুঁজি বিনিয়োগ করা যাবে, জাতি গৌরব ও মর্যাদা লাভ করবে। প্যারিসের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি গার্নিয়ের ও দুপ্রেকে সরকারি সাহায্য না দেবার সমালোচনা করেছিল। এই অঞ্চল শুধু ফরাসি বাণিজ্যের সহায়ক নয়, ফরাসি সভ্যতা বর্বরদের সভ্য করবে এমন ছিল আশা। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী জুলস ফেরি এদের সমর্থন করেন। ইনি দূরপ্রাচ্যে আগ্রাসী সক্রিয় নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেকে উদারপন্থী মুক্ত অবাধ অর্থনীতির সমর্থক বলে পরিচয় দেন। বণিক ও পুঁজিপতিদের কথায় তিনি উপনিবেশের গুরুত্ব উপলবব্ধি করেন। লাভজনক বাজারের অন্বেষণ করেন। তিনি লিখলেন বর্তমান পৃথিবীতে উপনিবেশের প্রয়োজন আছে, এখানে ধনী দেশের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ফরাসি বাণিজ্যের মন্দা চলেছিল, এজন্য ফেরি উপনিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি টংকিং জয়ের একটি কারণ দেখালেন, ভবিষ্যতের জন্য চিনের প্রবেশ মুখে এই অঞ্চল অধিকার করার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ ও ভবিষ্যতের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে টংকিং অধিকার করা দরকার(Pacific conquest)।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স হস্তক্ষেপের অজুহাত পেয়ে যায়। ফ্রান্স অভিযোগ করেছিল যে চিনে নজরানা পাঠিয়ে ভিয়েতনাম প্রোটেক্টরেট শর্ত ভঙ্গ করেছিল। হেনরি রিভেয়েরের ব্ল্যাক ফ্লাগ দস্যুদের

দমনের ব্যাপারে মান্ডারিনরা বাধা দিয়েছিল ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের চাপে আনাম প্রটেক্টরেট চুক্তি করতে বাধ্য হয়। টংকিং-এর শাসনকালের ফরাসিদের বাধা দিয়ে ছিল। মুহূর্তে ভিয়েতনামের সম্রাট চিনের সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেছলেন ফরাসিরা চিনের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাং সনে ফরাসরা পরাস্ত হয়। এই ঘটনার জন্য মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ফ্রান্স ফরমোজার কিংলুং আক্রমণ করে প্রতিশোধ ?? পেসকাডোরিস দ্বীপ দখল করে ফুচাও বন্দর অবরোধ করেছিল। চিনা নৌবহর পরাস্ত হয়। শেষপর্যন্ত দুর্বল চিনা সৈন্য আধুনিক ফরাসি সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। চিন ফ্রান্সের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিয়েনসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করেছিল ঐ চুক্তিতে চিন টংকিং ও আনামের ওপর ফরাসি প্রটেক্টরেট মেনে নিয়েছিল। দক্ষিণ চিনে ফরাসিরা বাণিজ্যিক অধিকার পেয়েছিল, উনানে ফ্রান্সকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। চিন ও ভিয়েতনামের মধ্যে দু'হাজার বছরে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, ফ্রান্স সমগ্র ভিয়েতনামের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল।

ভিয়েতনাম অধিকারের পর ফরাসি নৌসেনাপতিরা দেশটি শাসন করেন। ক্ষমতাচ্যুত হবার আগে তারা লাওস অধিকার করেন। আধুনিক লাওস রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় চতুর্দশ শতকের মধ্যে ভাগে। উত্তর-পূর্ব আনাম ও রেড নদী থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিমে মেনাম পর্যন্ত এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল। এই দেশটি বৌদ্ধ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। এদের নেতৃত্বে ছিল থাইরা, ভাষা ছিল থাই। স্থানীয় ঐতিহ্যে রাজ্যটির নাম লান চাং, তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত—উত্তরে লুয়াং প্রাবাং, মধ্যাঞ্চলে ভিয়েনতিন, দক্ষিণে চাম্পাসাক। মধ্যাঞ্চলের ওপর আনামরে প্রভাব ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল নামমাত্র ছিল সিয়ামের অধীনস্থ শাসক। মেকং ও তার শাখা নদীগুলির তীরে লাওসের মানুষজন বাস করত। অভ্যন্তরে পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক উপজাতি বাস করত। এরা চাষবাসে অভ্যস্ত ছিল। এদের সঙ্গে লাওস, খমের ও দক্ষিণ-চিনের মানুষজনের অনেক মিল ছিল। লাওসের অধিবাসীদের সঙ্গে সিয়ামের চিয়েংসাই ও চিয়েনগ্রাই মানুষের অনেক মিল ছিল। তারা থাই ভাষা ব্যবহার করত, এতে অনেক পালি শব্দ ছিল। থাইরা এদের সঙ্গে অনেক সময় খারাপ ব্যবহার করত, তা সত্ত্বেও এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কারণ তারা ভিয়েতনামিদের খুব অবিশ্বাস করত। এদের সঙ্গে তাদের কোনো মিল ছিল না। মধ্য উনিশ শতকে ভিয়েতনাম মধ্যাঞ্চলে সিয়ামের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে নেন। প্রতিরোধ চূর্ণ করে থাই রাজা তৃতীয় রাম এই অঞ্চল থাইল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই নিয়ে ভিয়েতনাম ও থাই রাজ্যের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি হয়। আর দুটি অঞ্চল কার্যত সিয়ামের গভর্নররা শাসন করত। যখন ফরাসি আগ্রাসন বাস্তব হয়ে দেখা দেয়, থাই সৈন্য লুয়াং প্রাবাং এ প্রবেশ করে রাজকীয় ভাইসরয়কে ব্যাংকক নিয়ে যায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড ও জাপের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে লাওসের ওপর থাই কর্তৃত্ব কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়, লুয়াং প্রাবাং-এ একজন ফরাসী ভাইস-কনসাল রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সূত্র ধরে ফ্রান্স লাওসে অনুপ্রবেশ চালিয়েছিল। লাওসে ফাসি কনসাল অগাস্ট পাভি দুটি কাজ করেন। থাই বিরোধী মনোভাবকে তিনি উৎসাহ দেন, আর ফরাসি প্রটেক্টরেট গ্রহণের পক্ষে প্রচার চালান। একটি ঘটনায় তিনি উত্তরের গভর্নরকে রক্ষা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকারের সমর্থন নিয়ে নৌবাহিনীর অফিসাররা এখানে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। ফরাসিরা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে লাওস দখল করার পরিকল্পনা করেছিল। থাই অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা ছিল।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পাভি ব্যাংকে মন্ত্রী হিসেবে যান, লাওসকে ফরাসি অধিকারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আলাপ করে ফরাসিরা বুঝেছিল ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নেই। ফরাসি সম্প্রসারণবাদীরা দ্রুত পদক্ষেপ করেছিল। ব্যাংকক থেকে দুইজন ফরাসি দূতকে বিতাড়িত করলে ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। সিয়াম সামরিক ঘাঁটি ভেঙে দিতে বলা হয়। ব্রিটিশ সরকার থাই সরকারের পক্ষ নেয়নি বরং ফ্রান্সের দাবি মেনে নেবার পরামর্শ দিয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাভি নৌবাহিনী পাঠিয়ে সিয়ামকে ভয়ে দেখিয়েছিল, বাহিনী ব্যাংকক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, প্যারিসের নির্দেশ উপেক্ষা করে পাভি একাজ করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক প্রশ্নে অনেক জায়গায় বিরোধ চলেছিল। রাশিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফ্রান্স সিয়ামের কাছ থেকে লুয়াং প্রাবাং, ভিয়েনজিন ও চাম্পাসাক দাবি করেছিল। ব্রিটিশ সিয়াম ও ফরাসি উপনিবেশের মধ্যে বাফার জোন দাবি করেছিল, ফ্রান্স রাজি হয়। ফরাসিরা মেনাম নদী অবরোধ করলে রাজা চুলালংকর্ণ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসি দাবি মেনে নেন। ফরাসিরা চান্টাবুন বন্দর, বাট্টামবাং ও সিয়েমরিপ প্রদেশ দাবি করেছিল। মেকং তীরে ২৫ কিমি অঞ্চল ফরাসি দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমান্ত নিয়ে সিয়াম, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আঁতাত কর্ডিয়েল পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। ঐ বছর ফ্রান্স চান্টাবুন থেকে সরে যায়, এশীয় প্রজাদের জন্য অতিরাষ্ট্রিক অধিকারের দাবি ত্যাগ করেছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের জন্য থাইল্যান্ড বাট্টামবাং ও সিয়েমরিপ ছাড়তে বাধ্য হয়। ব্রিটেনের অধীনস্থ প্রণালী রাজ্যগুলি সিয়ামের সমস্ত উত্তর মালয় রাজ্য অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিল। এরফলে হয়তো ফ্রান্স সিয়ামের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলত, ব্রিটেন তা চায়নি। সিয়াম পূর্ব সীমান্তে ৯৬০০০ বর্গ মাইল অঞ্চল হারিয়ে ছিল। লুয়াং প্রাবং-এর রাজা তার উপাধি ও অধিকার কিছু বজায় রাখেন। লাওসের বাকি অঞ্চল ভিয়েনতিন চাম্পাসাক ও জিয়েংফোয়াম করানি প্রদেশে পরিণত হয়। ফরাসি, প্রেসিডেন্ট সুপিরিয়র ভিয়েনতনে থেকে লুয়াং প্রাবাৎ সহ সব অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। আর্থিক উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা হয়, দাস প্রথার উচ্ছেদ হয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হয়। স্থানীয় প্রথা ও স্থানীয় শাসকদের কর্তৃত্ব তাঁরা কর্ব করেননি। ভিয়েতনামের সঙ্গে লাওসের সংযুক্তির প্রস্তাব হলে লাওসের জনগণ তার প্রতিবাদ করেছিল। অন্য কোনো সমস্যা হয়নি।

১৬-৩.৭.৪ পল ডুমারেব(Paul Doumer) সংস্কার (১৮৯৭-১৯০২)

উনিশ শতকের শেষদিকে ফরাসি ইন্দো-চিনে সংস্কারের দাবি উঠেছিল, পল আরমান্ড রুশো প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইন্দো—চিনের গভর্নর জেনারেল হন পল ডুমার। ইন্দো-চিনে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রধান স্থপতি হলেন তিনি। ১৮৯৭-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এখানকার শাসক ছিলেন। ইন্দো-চিনের প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হলেন তিনি। তিনি ফ্রান্সের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন, ভালো সংগঠক ছিলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করেননি। ইন্দো-চিনের যোগাযোগ ও পরিবহনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট অবদান

রেখেছিলেন। ইন্দো-চিনকে তিনি ফ্রান্সের সবচেয়ে সম্পদশালী উপনিবেশ পরিণত করেন। তাঁর সংস্কারকে ভিত্তি করে ইন্দো-চিনের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আবর্তিত হয়। তাঁর ইন্দো-চিনে আগমনের আগেই এখান ফরাসি শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু শান্তি ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ছিল না, দুর্নীতি ছিল, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সরকার ছিল না, অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের চেষ্টা হয়নি।

ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া) ও লাওস নিয়ে ইন্দো-চিন। কোচিন-চিনে ফরাসিরা তিন খণ্ডে বিভক্ত করেছিল—টংকিং, আনাম ও কোচিন-চিন। কোচিন-চিনে ফরাসিদের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হয়। ভিয়েতনামিদের বিদ্রোহ দমন করে ফরাসিরা এখানে প্রটেক্টরেট স্থাপন করেছিল। ভিয়েতনামের সম্রাটের নামে শাসন পরিচালনা করত স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী মান্ডারিনরা (Mandarins)। এই মান্ডারিনরা ফরাসিদের সঙ্গে সহযোগিতা করত না। কোচিন-চিনের ফরাসি গভর্নর বোনার্ড (Bonard) মান্তারিণদের জায়গায় ফরাসি ইনস্পেক্টর নিয়োগ করেন, ফরাসি সামরিক অফিসাররা পরোক্ষভাবে শাসন করতে থাকেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ ফরাসিরা টংকিং ও আনাম ভিয়েতনামের সম্রাটের সাথে এই দুই অঞ্চল নিয়ে প্রটেক্টরেট চুক্তি দুই অঞ্চলে মান্ডারিনরা ফরাসিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তবে অভিজাতদের একাংশে ফরাসি বিরোধী ছিল।

উত্তর ও মধ্য ভিয়েতনামের যখন প্রটেক্যরেট, দক্ষিণে কোচিন-চিনে ফরাসিদের ব্যক্তিগত অধিকার ও শাসন স্থাপিত হয় (Private domain)। এখানে ছিল একটি কলোনিয়াল কাউন্সিল যা কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতষ্ঠায় বাধা দিত। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-চিন সরকার ইন্দো-চিন ইউনিয়ন গঠন করেছিল, সারা দেশের জন্য ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। কোচিন-চিনের ফরাসিরা এসব পরিকল্পনার বিরোধী ছিল। গভর্নর-জেনারেল শুধু টংকিং ও আনামরে শাসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-চিনে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় প্রয়াস লক্ষ করা যায়, গভর্নর জেনারেল বর্ধিত ক্ষমতা পান। ইন্দো-চিন ইউনিয়ন পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলেছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধীরা এবারও সফল হয়। পল ডুমার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কেন্দ্রীয় শাসনের পরিচালক হবে ফরাসিরা। টংকিং ও আনামে ভিয়েতনামিরা যে শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করত পল ডুমার তা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন। টংকিং ও আনামের দুটি স্বতন্ত্র প্রটেক্টরেট স্থাপন করা হয়, সম্রাট নামমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান ছিলেন। আসল ক্ষমতা চলে যায় ফরাসিদের হাতে, টংকিং পৃথক হয়ে যায়।

টংকিং শাসনের জন্য ফরাসি রেসিডেন্ট সুপিরিয়র নিয়োগ করেন পল ডুমার। তিনি সম্রাটের নামে শাসন করলেও দায়বদ্ধ ছিলেন ফরাসি গভর্নর- জেনারেলের কাছে। টংকিং-এর ওপর ফরাসি নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে ডুমার আনাখেমর কোমাট (Comat) নামক সিক্রেট কাউন্সিল ভেঙে দেন। তিনি যে নতুন কাউন্সিল গঠন করেন তাতে ফরাসিদের সমান আধিপত্য ছিল। এই কাউন্সিলের প্রধান হন আনামের রেসিডেন্ট সুপিরিয়র, সম্রাট নন। ফরাসি শাসন সমস্ত কর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সম্রাট ভাতা পান, মান্ডারিনরা সকলে হল সরকারি কর্মচারী। ডুমার ভিয়েতনামের তিন অংশের ওপর ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। টংকিং ও আনামে ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের পর তিনি ঐক্যবদ্ধ

ইন্দো-চিন কায়েমি স্বার্থপুষ্ট ব্যক্তি যেমন কনট্রাক্টর, ফাটকবাজ, সৈনিক, প্রশাসক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকরা নানাভাবে অর্থশালী হয়ে উঠেছিল। এরা জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবেনি, ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণ ছিল এদের লক্ষ্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় কোচিন-চিনে ঔপনিবেশিকরা নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। ফরাসিদের ভোটাধিকার ছিল ৭৫ শতাংশ, সরকারি চাকরিতে তারা নিযুত ছিল, ভিয়েতনামিদের ভোটাধিকার ছিল না। কনোলিয়াল কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিত কী কর বসানো হবে কোন কোন খাতে অর্থ ব্যয় হবে।

গর্ভনর ডুমার কোচিন-চিনে কাউন্সিলের সঙ্গে বিরোধ এড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের অনুমতি নিয়ে তিনি ইন্দো-চিন কাউন্সিল গঠন করেন, এরা সদস্য ছিল পাঁচটি ইন্দো-চিল রাজ্য—টংকিং, আনাম, কোচিন-চিন, কাম্বোডিয়া ও লাওস। এই কাউন্সিলের প্রধান হন গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং, এর সদস্য হন সৈন্যবাহিনী, নৌবহর প্রধান, টংকিং, আনাম ও কোচিন-চিনের প্রধান শাসকেরা কাম্বোডিয়া ও লাওস, কৃষি ও বাণিজ্য সংস্থার সভাপতিরা। শাসনের জন্য ডুমার গঠন করেন জেনারেল সার্ভিসেস নামক আমলাতন্ত্র, স্থানীয় শাসনের ওপর এদের কর্তৃত্ব ছিল। সমগ্র ইন্দো-চিনকে তিনি একই বাজেটের মধ্যে আনার প্রস্তাব দেন, কোচিন-চিনের বাধাদান সত্ত্বেও ফরাসি সরকার ডুমারকে সমর্থন করেন। এভাবে ফ্রান্স শাসিত ইন্দো-চিনের জন্ম হয়। ফরাসি সরকারের অনুমোদন নিয়ে তিনি কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, ডাক-তার জনকল্যাণমূলক কাজ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ গঠন করেন। ডুমার বিরোধী দল ব্ল্যাঙ্কি ও তাঁর অনুগামীরা বাধা দিয়ে ব্যর্থ হন। এই সংস্থা বাজেট, সামরিক সমস্যা, জনহিতকর কাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প, শাসন, আইন সব পর্যালোচনা করার অধিকার পেয়েছিল। এসব চেম্বার্সের সদস্যরা প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য ছিল। এরা সরকারি কনট্রাক্ট, রাজস্ব সংগ্রহ ও পোতাশ্রয়গুলি তদারকির কাজ করত। কোচিন-চিনে একটি চিনা চেম্বার অব কর্মাস ছিল।

প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে ডুমার অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে হাত দেন। তিনি মনে করেন ইন্দো-চিন শাসনের জন্য অর্থ স্থানীয় সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইন্দো-চিনের পাঁচটি অঞ্চলে অথয় সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন ছিল তার নীতি। স্থানীয় শাসনের হাতে তিনি প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত কর সংগ্রহের অধিকার দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখেন পরোক্ষ করসমূহ ও শুল্ক। আফিম, মদ ও লবণের একচেটিয়া বাণিজ্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পল ডুমারের জুড়ি ছিল না, তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যবস্থা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। টংকিং বাজেটে ভারসাম্য ফিরে এসেছিল, পুরোনো ঘাটতি তিনি মিটিয়ে ফেলেন। টংকিং-এর সংরক্ষিত তহবিল হল ৪ মিলিয়ন পিয়াস্টার। ডুমার আনামের আয় বাড়িয়েছিলেন দুই গুণ, কোচিন-চিনের কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ ইন্দো-চীন স্থিতিশীলতা ছিল। এরা ডুমারের প্রকল্পে অর্থ জুগিয়ে ছিল।

জেনারেল বাজেটের জনহিতকর কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এর জন্য ৪০ মিলিয়ন পিয়াস্টার সংগ্রহ করা হয়। মিলিটারি বাজেটে ১৪ মিলিয়ন অর্থ দেওয়া হয়। ফরাসি সরকার তার

আবেদনে সাড়া দিয়ে রেলপথের জন্য ২০০ বিলিয়ন ফ্রাঁ দিতে রাজি হয়। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য তিনি রেল ও স্থলপথ স্থাপনের ওপর জোর দেন। কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প অনুমোদন করে কাজ শুরু করা হয়। ইন্দো-চিনকে তিনি একটি আধুনিক সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু ফরাসি নাগরিককে নিযুক্ত করেন, গঠনমূলক প্রকল্পগুলি কার্যকর করার জন্য এদের দরকার হয়। ডুমার মনে করেন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন রাস্তাঘাটের, বিশেষ করে রেলপথের। ২০০ মিলিনয় ফ্রাঁ যে ঋণ তিনি পেয়েছিলেন তা রেলপথ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হয়। জেনারেল বাজেটের অর্থেও তিনি রাস্তা, রেলপথ ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি মনে করেন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দেশের উন্নয়ন ঘটাবে। ১৭০০ কিমি দীর্ঘ দুটি রেল প্রকল্প তিনি অনুমোদন করেন। একটি ছিল হাইফং থেকে হ্যানয়, সেখান থেকে চিন সীমান্ত, অন্যটি ট্রান্স ইন্দো-চিন পথ, হ্যানয় থেকে সায়গন। রেলপথ নির্মাণের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু এতে নানাধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। এই রেলপথ ছিল ব্যয়বহুল আর রেলপথে পরিবহনের মতো পণ্য ইন্দো-চিনে বেশি ছিল না। এই রেলপথ সংক্রান্ত ব্যয় ইন্দো-চিনের বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ডুমারের রেলপথ প্রকল্প থেকে ইন্দো-চিন বা ফ্রান্স কেউই লাভবান হয়নি।

ডুমার পরিবহনের জন্য পোতাশ্রয়, জলসেচের জন্য বাঁধ ও খাল খনন করেন। এই ধরনের প্রকল্প আরো বেশি গৃহীত হলে ভিয়েতনাম লাভবান হত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি স্থায়ী অবদান রেখে যান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, আবহাওয়াবিদ্যা, পরিসংখ্যান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠশড় গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে ফরাসিরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। এক্ষেত্রে তিনি যতখানি সাফল্য লাভ করেন শাসনের ক্ষেত্রে ততখানি পাননি। সবক্ষেত্রে শ্বেতকায়দের প্রাধান্য ছিল, ফ্রান্স থেকে প্রচুর কর্মচারী এনে তিনি কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করেন। শাসন ব্যবস্থায় অপচয় ও দুর্নীতি রয়ে যায়। ডুমারের সংস্কারে এক প্রধান ত্রুটি হল আধুনিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরি না করে তিনি আধুনিক শাসন স্থাপন করেন। একথা ঠিক ডুমারের শাসনকালে ইন্দো-চিনের বাণিজ্য বেড়েছিল দুই গুন ফ্রান্সের সঙ্গে তিনগুণ। এর বেশিরভাগ ছিল চাল রপ্তানি, আর রেল যন্ত্রপাতির আমদানি। তিনি অনুমান করতে পারেননি তাঁর শাসন সংস্কার কী ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর সংস্কারের ফলে ইন্দো-চিনের জনগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেনি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি। তাঁর সংস্কার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তবে পল ডুমারের সংস্কারের ফলে ইন্দো-চিনে ফরাসি শাসন শক্তিশালী হয়।

জন ক্যাডি পল ডুমারের সংস্কারের দুটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর চরিত্র ছিল মার্কেন্টাইলিস্ট, এর লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষা করা। ইন্দো-চিনের স্বার্থের কথা তিনি ভাবেননি। ফরাসিরা ইন্দো-চিনে পেয়েছিল কর্মসংস্থানের সুযোগ, বাণিজ্য ও লগ্নির সুযোগ-সুবিধা। এশিয়ার বাজার ও পণ্য সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ইন্দো-চিনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এইরকম অবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ফ্রান্সের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা সামাজিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নিয়ে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, পল ডুমারের শাসন কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ

করেনি। দ্বিতীয়ত, পল ডুমারের শাসন কৃষি ও শিল্পের উন্নতর জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ইন্দো-চিনের প্রথাগত শিল্পের অবনতি ঘটে। নতুন পরিস্থিতিতে শুধু বৃহৎ ভূস্বামী তার পুঁজি নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে ছিল। ভাগ-চাষ ব্যবস্থা বা দেশি মালিকানা তৈরি করা সম্ভব হয়নি কারণ জমির আইনগত মালিকানা তৈরি হয়নি। এর ফলে বন্ধকযোগ্য সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইউরোপয়রা ২০০,০০০ হেক্টর জমি অধিকার করেছিল, এগুলিতে তাদের চা, রাবার ও কফি বাগিচা গড়ে ওঠে। ফরাসিদের আগমনের আগে এখানে আখের চাষ ছিল। হনগেতে ছিল কয়লাখনি, দক্ষিণে চালকল, রেশমকল, মদ্য প্রস্তুত কারখানা, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা। লোহা, বস্ত্র ও চিন কল ছিল না। সমগ্র ইন্দো-চিন ছিল শিল্পে অনগ্রসর।

১৬-৩.৮.৫ ইন্দো চীনে ফরাসী উপনিবেশের প্রভাব

আলবার্ট সারায়ুটের (Sarruaut) শাসনকালে (১৯১১-১৭ খ্রিস্টাব্দ) ইন্দো-চিনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। তিনি এই শাসনের আমলাতান্ত্রিক ত্রুটিগুলি দূর করে শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। কর্মচারীদের জন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষা তিনি বাধ্যতামূলক করেন, আর শাসনের নিম্নস্তরে তিনি ভিয়েতনামিদের গ্রহণ করেন। তিনি যখন গভর্নর হিসেবে আসেন ৫৭০০ ফরাসি কর্মচারী দেশের ভাষা জানত না। তিনি এই অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনেকখানি উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি ফরাসি আইনবিধি অনুসরণ করে কোচিন-চিনের আইন সংহিতার অনেকখানি বদল করেন। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ভিয়েতনামের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক রীতিনীতি তিনি মেনে নেন। ফরাসি সরকার ইন্দো-চিন নিয়ন্ত্রণের জ্য বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, এখানকার আমলাতন্ত্র ও সার্কেল টাইলিষ্ট নীতির ওপর তার প্রভাব পড়ে ছিল।

অনেকগুলি কাউন্সিল ও কমিশন গঠন করা হয়েছিল যেগুলি সাম্মানিক এগুলি বণিক, কর্মচারী ও ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে যুক্তদের স্বার্থ রক্ষা করে চলত। মিনিস্ট্রি অব কলোনিজ ছ'টি বিভাগে বিভক্ত ছিল শাসন, অর্থ, কর্মচারী তদারকি, মিলিটারি, পুলিশ ও মেডিকেল সার্ভিসেস। শাসন তদারকির জন্য ইন্সপেক্টররা ছিল। শিক্ষা বিভাগ ছিল। কাউন্সিল সুপিরিয়র ১৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, এর মধ্য ৎছও হাই কাউন্সিল, ইকোনমিক কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। এগুলিতে ফরাসিরা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান ছিল বিচ্ছিন্ন ও অদক্ষ। বিভিন্ন উপনিবেশে চেম্বার্স অব কর্মাস ও চেম্বার্স অব এগ্রিকালচার ছিল। ইউনিয়ন কলোনিয়ান ফ্রাঁসাজে দশটি জিওগ্রাফিক্যাল সেকশন ছিল। উপনিবেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা ফ্রান্সে ছিল না, চেম্বার অব ডেপুটিজে (নিম্নকক্ষ) নামমাত্র প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ফ্রান্সের আইনসভা উপনিবেশের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইন্দো-চিনে একটি কলোনিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়, এই কাউন্সিলে দশজন স্থানীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। এই সংস্থার সিদ্ধান্ত গভর্নরদের প্রিভি কাউন্সিল বাতিল করতে পারত। এই প্রিভি কাউন্সিলের ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিল স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি।

ইন্দো-চিনে ফরাসি শাসনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ফরাসি সংস্কৃতি ও জাতীয় প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যানয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় (একল ফ্রাঁসাজ),

এই সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক-ইউরোপীয় পর্বের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তৃত গবেষণা করেছিল। ঔপনিবেশিক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের সংস্কৃতি ও জীবনধারা বুঝতে হলে এর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে এই অঞ্চল যে লাভবান হয়েছিল তাও তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এদের বোঝানোর দরকার ছিল রাজনৈতিকভাবে তারা লাভবান হয়েছে। অসুবিধা হল মার্কেন্টাইল নীতির সঙ্গে এসবকে মেলানো ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফরাসিরা উচচবর্গের মানুষজনকে শাসনের জন্য মনোনীত করেন। এখানকার আমলাতন্ত্র ও মার্কেন্টাইলিসস্ট নীতির ওপর তার প্রভাব পড়েছিল অনেকগুলি কাউন্সিল ও কমিশন গঠন করা হয়েছিল। পদগুলি ছিল এগুলি বণিক, কর্মচারী ও ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্তদের স্বার্থ রক্ষা করে চলত। মিনিস্ট্রি অব কলোনিজ ছ'টি বিভাগে বিভক্ত ছিল শাসন, অর্থ, কর্মচারী তদারক, মিলিটারি, পুলিশ ও মেডিকেল সার্ভিসেস। তাদের তদারকির জন্য ইন্সপেক্টররা ছিল। শিক্ষা বিভাগ ছিল। কাউন্সিল সুপিরিয়র ১৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, এর মধ্যে ছিল হাই কাউন্সিল, ইকোনমিক কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। এগুলিতে ফরাসিরা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান ছিল বিচ্ছিন্ন ও অদক্ষ। বিভিন্ন উপনিবেশে চেম্বার্স অব কর্মাস ও চেম্বার্স অব এগ্রিকালচার ছিল। ইউনিয়ন কলোনিয়ান ফ্রাঁসাজে দশটি জিওগ্রাফিক্যাল সেকশন ছিল। উপনিবেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ফ্রান্সের আইনসভা উপনিবেশের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইন্দো-চিনে একটি কলোনিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়, এই সংস্থা সিদ্ধান্ত গভর্নরদের প্রিভি কাউন্সিল বাতিল করতে পারত। এই প্রিভি কাউন্সিলের ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিল স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি।

ইন্দো-চিনে ফরাসি শাসনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ফরাসি সংস্কৃতি ও জাতীয় প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যানয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় (একল ফ্রাঁসাজ), এই সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক-ইউরোপীয় পর্বের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তৃত গবেষণা করেছল। ঔপনিবেশিক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের সংস্কৃতি ও জীবনধারা বুঝতে হলে এর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে এই অঞ্চল যে লাভবান হয়েছিল তাও তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এদের বোঝানোর দরকা ছিল রাজনৈতিকভাবে তারা লাভবান হয়েছে। অসুবিধা হল মার্কেন্টাইল নীতির সঙ্গে এসবকে মেলনো ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফরাসিরা উচ্চবর্গের মানুষজনকে শাসনের জন্য মনোনীত করেনি। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতের মানুষের সঙ্গে মেশেনি, দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল। সম্ভ্রম আদায় করেছিল, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। ফরাসিরা স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল, দূরত্ব বজায় রাখেনি। পিতৃসুলভ সহানুভূতির সঙ্গে স্থানীয় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিল, দুরত্ব বজায় রাখেনি। পিতৃসুলভ সহানুভূতির সঙ্গে স্থানীয় আদব-কায়দা শাসন করেছিল। এরা চেয়েছিল উপনিবেশের মানুষজন ফরাসি-আদব কায়দা চিন্তা-ভাবনা সব গ্রহণ করুক। এজন্য ফরাসিরা ঔপনিবেশিক জনগণের থেকে তেমন শ্রদ্ধা আদায় করতে পারেনি। ইন্দো চিনের পাঁচটি প্রশাসনিক ইউনিটের (কোচিন-চিন, আনাম, টংকিং, কম্বোডিয়া লাওস) মধ্যে কোচিন-চিনের স্বাতন্ত্র্য ছিল। এটি ছিল প্রধানত ফরাসিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। দক্ষিণে ফরাসি প্রভাব বেশি ছিল কারণ এখানে কনফুসীয় প্রভাব তেমন জোরালো ছিল না উত্তরে কনফুসীয় প্রভাব বেশি ছিল। এই অঞ্চলে এক হাজার বছর ধরে চিনের শাসন চলেছিল। টংকিং-এর শহর

অঞ্চলে ফরাসি প্রভাব পড়েছিল কারণ এখানে কয়েকটি শিল্প ছিল। আনামের উপকুল বরাবর, কোচিন-চিন থেকে টংকিং, প্রায় কোনো শিল্প ছিল না। ফরাসিদের এই অঞ্চলে তেমন উদ্যোগ ছিল না। এই অঞ্চলে ভিয়েতনামের পুরোনো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর প্রভাব ছিল। হুয়েতে প্রাচীন ভিয়েতনামি রাজসভার রীতিনীতির চলন ছিল। নমপেনের বাইরে কাম্বোডিয়ার ফরাসি প্রভাব পড়েনি, লাওসে ফরাসি প্রভাব ছিল আরো কম।

ভিয়েতনামের মানুষজনকে ফরাসিদের মতো করে গড়ে তোলার পথে অনেক বাধা ছিল। এদের অনুগত ও বশীভূত করে রাখার সমস্যাও ছিল। যারা ফরাসি ভাষা শিখেছিল শুধু তাদের ফরাসি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। যারা দশ বছর সরকারি চাকরি বা সৈন্যবাহিনীতে কাটিয়েছে তাদেরও এই সুবিধা দেওয়া হয়। যেসব ভিয়েতনামি ফরাসি মহিলা বিবাহ করত বা লিজিও অব অনার পেত তারা ফরাসি নাগরিক হত। কাম্বোডিয়া ও লাওসে পুরোনো সংস্কৃতির তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। এখানে যেসব বৌদ্ধ বিদ্যালয় ছিল সেগুলি আগের মতো বজায় ছিল। কোচিন-চিনে পুরোপুরি ফরাসি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল, তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় চিনাদের প্রাধান্য ছিল। ভিয়েতনামে পরিবর্তনের ধারা অন্যরকম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হলে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ প্রাথমক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, তবে এই শিক্ষার সুবিধা পেয়েছিল ভিয়েতনামের ১২ জন বালকের একজন, বালিকাদের ১০০ জনের মধ্যে ১ জন। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ছিল আরো সীমিত, হ্যানয়ের সবচেয়ে বড়ো বিদ্যালয়ে মাত্র ৫০০-৮০০ ছাত্র পড়ার সুযোগ পেত যদিও শিক্ষার চাহিদা বেড়ে চলেছিল, আরো বেশি ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ ছিল। মাধ্যমিক স্তরের কিছু ছাত্র পরাসি শেখার সুযোগ পেত। ফরাসি না শিখলে হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যেত না। এই বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নর সারায়ুট ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন। এর পাঠক্রম ছিল উদার, বিশ্বজনীন। কিন্তু ছাত্র অসন্তোষ শুরু হলে কর্তৃপক্ষ শিল্পসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এর এগারোটি শিল্প বিদ্যালয়ে ১১০০র কম ছাত্র ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ছিল ত বা ৪:১। ইউরোপীয় মডেলের বিদ্যালয়গুলিতে ফরাসি শিক্ষকের আধিক্য ছিল। ইন্দো-চিন কর্তৃপক্ষ আনুগত্যহীন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয় চালানোর কথা ভাবেনি। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেখ দেব যেসব ভিয়েতনামি ছাত্র ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেছিল তাদের ক্ষেত্রে। এদের নিয়োগ করা ছিল বেশ কঠিন কাজ।

ফরাসি শাসন পুরোনো জীবন সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় তবে এর তেমন গভীরতা ছিল না। গ্রাম প্রধানের কর্তৃত্ব আর আগের মতো ছিল না, এর ফলে সামাজিক সংহতি অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়েছিল। গ্রাম থেকে দূরে বসবাস করার পর অনেক গ্রামের মানুষ পূর্বপুরুষ পূজার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। অনেক শিক্ষিত মানুষ প্রাচীন প্রথাগুলির যৌক্তিকতা মেনে নেয়নি, এতে গ্রাম প্রধানের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। শিক্ষিত মানুষজন ঐতিহ্য নয়, ফ্রান্সের মানুষের অধিকারের ঘোষণা ও আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে ক্ষমতার উৎস খুঁজেছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথাগত ধর্ম ও সংস্কৃতি, পূর্বপুরুষ পূজা সবই অটুট ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর ভিয়েতনামের ফরাসি শাসনের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। টংকিং অঞ্চলে এই বিরোধিতা বেশি ছিল। উপনিবেশ হতাশা ছিল, স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে গৌরববোধ ছিল, এসবের ওপর ইউরোপীয়রা আক্রমণ চালিয়েছিল। ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হয়। পশ্চিমি

জীবনধারা সম্পর্কে অনীহা দেখা দেয়। তবে এই পশ্চিমি বিরোধিতা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ভিয়েতনামিরা বিদেশি বিরোধিতায় নেমেছিল। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল এমন সব মানুষজন যারা মনে করে তাদের প্রথাগত জীবন ও সংস্কৃতি পশ্চিমিদের চেয়ে ভালো ও উন্নততর। বিদেশি-আচার আচরণ সম্পকে এরা অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করত। অন্যদিকে আর একটি তরুণ পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী ছিল। এরা প্রথাগত জীবন ও সংসত্মকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, আবার নতুন জীবনধারাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তৃতীয় আর এক শহুরে শিক্ষিত উদারপন্থী গোষ্ঠী ছিল, এদের অনেকে খ্রিস্টান। এরা ফরাসি সংস্কৃতি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে গ্রহণ করেছিল, গুরুত্ব বুঝেছিল। কিন্তু ফরাসি শাসন তাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা দেয়নি। এজন্য বিরক্ত ছিল। অল্প কয়েকজন মার্কসবাদে দীক্ষিত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে টংকিং রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তুলেছিল, কিন্তু এই দাবি সংগঠিত বা ঐক্যবদ্ধ ছিল না, কর্তৃপক্ষ একে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি।

১৬-৩.৮.৬ ভিয়েতনামের দেশ-জাতি ও জনবিন্যাস ঃ

ভিয়েতনামে ফরাসি শাসনের শুরুতে এবং একেবারে শেষদিকে জনবিন্যাসে অসমতা ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনামের ১১ মিলিয়ন মানুষের মধেয় ৯ মিলিয়ন লোকের বসতি ছিল টংকিং ও আনামের উপকূলভাগে, বাকিটা ছিল মেকং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। উত্তরে জনবসতির ঘনত্ব ছিল দক্ষিণের দশগুণ।[৪] এই জনবিন্যাস ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত, উভয় থেকে ধীরে ধীরে লোকজন দক্ষিণে এসেছিল। কয়েক প্রজন্ম ধরে এই অভিবাসন চলেছিল। জনসংখ্যার বিন্যাসে ম্যালেরিয়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়, উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি থাকায় লোকজন নিম্ন অঞ্চলে চলে এসে ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়। ভিয়েতনামিরা সমতলে বাস করতে পছন্দ করত, আবার উত্তরে ম্যালেরিয়ার জন্য জনসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি হয়নি। সত্তর বছর পরেও ভিয়েতনামের জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, উত্তর ও দক্ষিণের অনুপাতে কছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল, দক্ষিণে কিছু মানুষ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। জনবিন্যাসের ঘনত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। মেকং অববাহিকায় ঘনত্ব দু'গুণ হয়েছিল, প্রতি বছর বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশ। ভিয়েতনামের এই সময় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে বাস করত ৮০ জন। ভিয়েতনামের ১০ শতাংশ ভূমিতে ৮০ শতাংশ লোক বাস করত, এজন্য উপকূল ও বদ্বীপ অঞ্চলের ঘনত্বে বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়েছিল, পাহাড়ি অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইল মাত্র ২৬ জন বাস করত। বেশিরভাগ ভিয়েতনামি উপকূল অঞ্চলে বাস করতে ভালোবাসত, উত্তরের খনিতে বা মৈ মালভূমির জমিতে এরা কাজ করতে যেত, কিন্তু কাজের শেষে নিজের অঞ্চলে ফিরে আসত।

টংকিং অঞ্চলে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটত গড়ে ১ লক্ষ। এখানে শুধু জনবসতির ঘনত্ব ছিল না, কতকগুলি অঞ্চলে ঘনত্ব ছিল পৃথিবীর মধ্যে সেরা। সংকোই অঞ্চলে ১০০ মাইল ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ১৫৬০, কোনো কোনো স্থানে ২৬৬৪। উপকূল তীরবর্তী প্রদেশগুলিতে প্রতি বর্গমাইলে ৪২৪০-৬৩৬০ জন লোক বাস করত। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ঘনত্বে হেরফের হত। পার্বত্য অঞ্চলে এই ঘনত্ব সবচেয়ে কম। অনেক উপত্যকায় এত কম লোক ছিল চাষবাস, খনির কাজের জন্য চিনারা এসে হাজির হত। কাউবাং, লাংসন ও থাটখেতে এরকম পরিস্থিতি ছিল। আনামে জনবিন্যাস অনেকটা এরকম

ছিল। এখানকার ৮০ শতাংশ মানুষ উপকূলের সংকীর্ণ অঞ্চলে সমবেত হয়েছিল, এখানে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৭৮০ জন লোক বাস করত। আনামের জমির উর্বরতা অনুযায়ী ঘনত্বে হেরফের লক্ষ করা যায়। এখানে বসতির বিস্তার ঘটেছিল, জনসংখ্যা বেড়েছিল। এখানে অতি ঘনত্ব কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। যদিও বদ্বীপ অঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছিল, অনেকটা উত্তরের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনত্বের কারণগুলি সঠিক জানা যায় না, সবচেয়ে অঞ্চলের ক্ষেত্রেও কারণ স্পষ্ট নয়। একটি কারণ খুব সুষ্ঠ জমির উর্বরতা অন্য কারণ হল টংকিং উপত্যকায় ফরাসিদের গড়ে তোলা সেচ ব্যবস্থা আনামে দো-ফসলি অঞ্চল ও মৎস্যকেন্দ্রগুলিতে ঘনত্ব বেশি ছিল। ফরাসিরা ভিয়েতনামে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেছিল। আগে এসব রোগে এখানকার বহু মানুষ মারা যেত। পরিশেষে বলা যায় ফরাসি শাসন শান্তি ও স্থিতি নিয়ে এসেছিল হানাহানি বন্ধ হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষে ফরাসিরা কোচন-চিনে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঐ সময় জনসংখ্যা কিছুটা বেড়েছিল, তবে আনাম বা টংকং-এর চেয়ে কম ছিল। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি ছিল না তবে জনবিন্যাসে সমতা এসেছিল। প্রতি বছর এখানে প্রায় ৩০,০০০ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটত, এর বেশিরভাগ এসেছিল উত্তর বা বিদেশ থেকে। বাকিটা ছিল স্বাভাবিক বৃদ্ধি। এখানে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ছিল ১৫৮ জন, বদ্বীপ অঞ্চলে ২৬০ জন, টংকিং-এর চেয়ে বেশি। কোনো কোনো অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ৩৯০০ লোক বাস করত। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল মেকং অববাহিকা, নিম্ন ভাইকো ও সায়গন অঞ্চল, এখানে ৭০ শতাংশ লোক বাস করত। গড়ে প্রতি বর্গমাইলে বসতির ঘনত্ব হল ৩৬৮। এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল ফরাসি পুঁজিপাতিরা এখানকার ধান চাষে উৎসাহ দিয়েছিল। উত্তর-পূর্বে মালভূমিতে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। উত্তর থেকে এসব অঞ্চলে লোকজন এসেছিল, তবে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কাজকর্মে স্থানীয় কোচিন-চিনের লোকেরা নিযুক্ত ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর থেকে প্রতিবছর গড়ে ৪০০ লোক এখানে চলে আসত, মোট বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র অংশ। মহামন্দার সময় (১৯২৯-৩৪ খ্রিস্টাব্দ) কোচিন-চিনের লোকেরা শ্রমের সরবরাহ বজায় রেখেছিল।

১৬.৩৮.৭ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ

১. What was the impact of the reforms of Paul Doumer?

২. What do you know about the uification of Vietnam?

পর্যায়-৪

পরিবর্তনের ভিয়েতনাম

১৬.৪.৯.১—সূচনা

১৬.৪.৯.২—ইন্দো চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৬.৪.১০.৩—জননায়ক হো-চি-মিন

১৬.৪.১০.৪—সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১৬.৪.৯.১—সূচনা

বর্তমানে পর্যায়ে আমরা ইন্দো চিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করব, তার সাথে জননেতা রূপে হো-চিমিনের মূল্যায়ন করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে।

১৬.৪.৯.২ - ইন্দো চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ভিয়েতনাম

চিনের দক্ষিণে টংকিং উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ভিয়েতনাম, এর তিন প্রদেশ , টংকিং, আনাম ও কোচিন-চিন। উনিশ শতকের শেষদিকে এই দেশটিতে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা এখানে এসেছিল, পরবর্তীকালে ধর্ম ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এখানে ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ভিয়েতনামে ফরাসি শাসন ছিল উৎপীড়নমূলক ও শোষণকারী, কৃষকের প্রথাগত জীবনধারা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। গ্রামীণ জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করত গ্রাম প্রধানরা। ফরাসিরা এই স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ধারাকে ভেঙে দিয়েছিল, কর স্থাপন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিল, জনগণনার ব্যবস্থা ফরাসি সংস্কৃতি প্রভাবিত উচ্চবর্গ তৈরি করেছিল, এরা হল ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত। দেশটি অধিকা করার পর শাসকশ্রেণি উচ্চহারে কর বসিয়েছিল, উৎপাদনের ২০ শতাংশ কর হিসেবে দিতে হত। ফরাসি শাসনকালে ভিয়েতনামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ঋণের দায়ে জমিদার ও মহাজনের কাছে তার জমি হারিয়েছিল। ভিয়েতনামে সব কৃষকের জমি ছিল না। জনবসতির ঘনত্ব ছিল খুব বেশি। অধিকাংশ মানুষ ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, দারিদ্র্য ও হতাশায় নিমজ্জিত।

ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন ভিয়েতনামে আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন করেনি, সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি, ৮০ শতাংশ ভিয়েতনামি ছিল অশিক্ষিত। জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যানয় বিশ্ববিদ্যলয় স্থাপিত হবার অল্পকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক সরকার অর্থোপার্জনের জন্য লবণ, আফিম ও মদের ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। দেশে বেগার শ্রম প্রথা ছিল। আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠেনি, যে কয়েকটি শিল্প ছিল তাতে ভিয়েতনামিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। শ্রমিকের মজুরি ছিল কম, জাতীয় আয়ের ছিল অসম বণ্টন, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন ছিল ভয়ংকর অত্যাচারী। দেশি মান্ডারিনদের সহায়তা নিয়ে ফরাসিরা দেশ শাসন করত। জনবিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দিলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তা দমন করা হত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভিয়েতনামের সব স্থানীয় বিদ্রোহ দমন কা সম্ভব হয়। ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। বেশিরভাগ মানুষের আয় ছিল খুব কম, ঋণগ্রস্ততা ছিল খুব বেশি তার ওপর ছিল অশিক্ষা, জুয়া ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি।

সমগ্র ইন্দো-চিনে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা হল ভিয়েতনামিরা। এই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যা হল ২৫ মিলিয়ন, তার ৭৫ শতাংশ হল ভিয়েতনামি। অনেক আগে এই ভিয়েতনামিদের এক ধরনের দেশজ জাতীয়তাবাদ দীক্ষা হয়েছিল। দশম শতক থেকে চিনের আধিপত্য থেকে মুক্তি কামনায় ভিয়েতনামিরা আন্দোন শুরু করেছিল। ভিয়েতনামের ওপর চিনা ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। বিশ শতকের গোড়ারদিকে চিনের সংস্কার আন্দোলন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভিয়েতনামিদের প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হল ভিয়েতনামি বুদ্ধিজীবীরা উদ্বুদ্ধ হন। এরা মনে করেন পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে হলে পশ্চিমি শিক্ষা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত

করতে হবে। ভিয়েতনামিরা ফ্রান্সে গিয়ে লেখাপড়া শেখেন কিন্তু দেশে ফিরে যোগ্য চাকরি পেতেন না। ভিয়েতনামে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উত্থানে চিনা প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ফরাসি গভর্নর পল বিউ (Paul Beau) ও আলবার্ট সারাউট (Albert Sarraut) ভিয়েতনামে উদারনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এতে ভিয়েতনামি বুদ্ধিজীবীরা উৎসাহিত হন। ফরাসি ও মার্কিন বিপ্লবের আদর্শ তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিনা সংস্কারক কাং (Kang Yuwei) তাদের পশ্চিমি সভ্যতা আয়ত্ত করার আহ্বান জানান। চিনা জাতীয়তাবাদী হুহান মিন ও সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদীদের যোগাযোগ ছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কুয়োমিনটাং দলের সাহায্য নিয়ে ভিয়েতনামিরা ক্যান্টন থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য রেস্টোরেশন অব ভিয়েতনাম। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ভিয়েতনাম ন্যাশনাল পার্টি। ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে এই দল অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে হো চি মিন গঠন করেন ইন্দো-চিন কমিউনিস্ট লিক। কমিউনিস্ট পার্টিও অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়, হো চি মিন হংকং-এ পালিয়ে যান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের ফরাসি শাসন এখান থেকে এক লক্ষ সৈন্য ও শ্রমিক সংগ্রহ করেছিল। যুদ্ধ শেষে এরা ফরাসি উদারনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে দেশে ফিরে আসে। শুধু তাই নয়, এদের বেশিরভাগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুদ্ধে পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের ঘোষণায় (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ছিল, ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদীরা উৎসাহিত হয়। জাতীয়তাবাদীরা মনে করে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হল সাম্যবাদীদের প্রচারিত ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম, অপরটি হল আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান আধুনিকীরকণ। ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদ নিজ ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবেনি। এই জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদানগুলি ছিল বিদেশি, স্বদেশি শিক্ষা ঐতিহ্য ও সংগঠন নয়। এক ধরনের দেশপ্রেম ছিল যা চিনা বিরোধী আন্দোলন থেকে এসেছিল। তবে এই অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অসংগঠিত জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যবোধ আধুনিক জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ভিতি তৈরি করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটলেও বহুকাল যাবত এই জাতীয়তাবাদ ছিল দুর্বল ও অসংহত। ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদের প্রথম নেতা হলেন ফ্যান চাও ত্রিন(Phan Chau Trinh)। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন সংস্কারপন্থী নেতা, ফরাসি সরকারের কাছে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত অপশাসনের অবসান ও শিক্ষার বিস্তার দাব করেন। ত্রিনের সমসাময়িক ফ্যান বোই চাও(Phan Boi Chau) ছিলেন প্রথমদিককার আর একজন গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী নেতা। এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফরাসি কারাগারে বন্দি জীবন কাটান। চাওয়ের আদর্শ অনুসরণ করে একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করা হয়।

ভিয়েতনামের ফরাসি বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন নগুয়েন আই কুয়োক (Nguyen Ai Quoc), সকলের কাছে তিনি হো-চি মিন নামে পরিচিত। জাতীয়তাবাদী অভুত্থান দমিত হলে কমিউনিস্টরা আত্মগোপন করেছিল। ইন্দো-চিন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে তিনি এর নেতৃত্ব দেন।

আধুনিক এশিয়ার ইতিহাসে এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব হলেন হো চি মিন। প্রথম জবনে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর স্বপ্ন। অল্প বয়সে কেবিন বয় হিসেবে তিনি ইংল্যান্ডে যান, সেখান থেকে প্যারিস। প্যরিসে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাবিদ, আজীবন সংগ্রামী এই নেতা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় যান, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সাম্যবাদীদের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নেন, সহকর্মীদের সাম্যবাদী বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষা দেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় যান, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সাম্যবাদীদের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নেন, সহকর্মীদের সাম্যবাদী বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষা দেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যান্টনে আসেন, ভিয়েতনামিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হংকং-এ বন্দি ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনামের সব ফরাসিবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ফ্রন্ট গঠন করেন। ভিয়েতনামের সব ফরাসিবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ফ্রন্ট গঠন করেন। ভিয়েতনামের সব ফরাসিবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ফ্রন্ট গঠন করেন। ভিয়েতনামে সোভিয়েত স্থাপিত হয়, ফরাসিদের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লিগ—ভিয়েতমিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হো চি মিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের জাতীয়তাবাদী সরকারকে সহযোগিতা করেন। যুদ্ধের সময় জাপান ভিয়েতনাম দখল করলে তিনি জাপানি দখলদারির বিরোধিতা করে যান। যুদ্ধের পর তিনি হলেন সমগ্র ভিয়েতনামের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ হল তাঁর খাঁটি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম। দেশের জন্য ভিয়েতমিন যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল তার মধ্যে তার সাফল্যের কারণ পাওয়া যায়। হো চি মিনের সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্বায়ত্তশাসন, নাগরিক অধিকার সকলের সমান অধিকার, সামন্তপ্রথা থেকে উদ্ভুত সব কর ও অধিকারের অবসান, এবং ফরাসি ঔপনিবেশিক মার্কেন্টাইল অর্থনীতির বিলুপ্তি। জাপানি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে (আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) হোচি মিন অস্থায়র সরকার গঠন করেন। যুদ্ধের পর পটসডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়র ভিয়েতনাম উত্তর ও দক্ষিণে ১৭° অক্ষাংশ বরাবর বিভক্ত হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশবাসীর জন্য এক সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ছিল ভূমি বণ্টন করের বোঝা থেকে অব্যাবহতি, সামাজিক সংস্কার জুয়া ও পতিতরবৃত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষার জন্য তাঁর সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিল। তবে ভিয়েতনামের দুই অংশে দুই সরকারের উপস্থিতি জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী কেউই পছন্দ করেনি। বিশাল জনসমর্থন নিয়ে গেরিলা বাহিন ভিয়েতকং গঠন করে তিনি প্রথমে ফরাসি (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করেন (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)

ভিতেয়নামে কমিউনিস্টদের সাফল্যের কারণ হল তাদের বাস্তববোধ, দেশপ্রেম, মৌল সংস্কার প্রয়াস ও শোষিত মানুষের বিপুল সমর্থন লাভ। ঐতিহাসিক হল লিখেছেন—সাম্রাজ্যবাদীদের গোয়ার্তুমি ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী দলগুলি এমন মৌল বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। হো চি মিনের অসামান্য ব্যক্তিতত্ব, আত্মত্যাগ, দক্ষতা ও দৃঢ়তা কমিউনিস্টদের সাফল্য এনে দেয়। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয় (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। হো চি মিনের আবাল্য লালিত স্বপ্ন সফল হয়।

কাম্বোডিয়া ও লাওস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে জাপান কাম্বোডিয়া ও লাওসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। জাপান সমগ্র ইন্দো-চিন অধিকার করেছিল (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। জাপানের অনুমোদন নিয়ে সম্রাট বাওদাই আনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার দুদিন পরে রাজা নরোদম সিংহানুক কাম্বোডিয়ার (কাম্পুচিয়া) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একমাস পরে রাজা সিসাভং ভং লাওসকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কম্বোডিয়া শাসক রাজা সিংহানুকের ফরাসী প্রীতির জন্য আপনি কতৃপক্ষ তাঁর সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল না। এজন্য তারা সব সগোক থানের নেতৃত্বে পরচালিত ফ্রি খমের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, অন্য ব্যক্তিত্ব হলেন পালি ভাষায় সুপন্ডিত পাচ ছৌছ। সন নগোক থান ছিলেন খমের-ভিয়েতনামি পিতামাতার সন্তান, সায়গন ও ফ্রান্সে লেখাপড়া শেখেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী, ফরাসি আধিকারিকরা তাঁকে পছন্দ করত, তাঁকে নমপেনের জাতীয় পাঠাগারে যোগ দিতে বলেছিল। তিনি খমের ভাষায় নগরবার্তা নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পাচ ছৌউনের সঙ্গে তিনি নমপেনের বৌদ্ধ ইনস্টিটিউটের নানা কাজে অংশ নেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ছিল কাম্বোডিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। এই স্থান থেকে প্রচারপত্র বণ্টন করা হত, বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হত। ফরাসি কর্তৃপক্ষ পাচ ছৌউনকে বন্দি করলে সন নগোক থান জাপানি সামরিক অফিসারদের সহায়তা নিয়ে জাপানে পালিয়ে যান।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জাপানিরা ইন্দো-চিন অধিকার করলে সন নগোক থান কাম্বোডিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি ফ্রি খমের আন্দোলন গড়ে তোলেন, সশস্ত্র স্বোচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করেন, পরে ভিয়েতনামের ভিয়েতমিনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন। সনের প্রভাব ও আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজা নরোদম সিংহানুক যিনি ফরাসিদের সমর্থক ছিলেন সনকে তাঁর বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। দুই মাস পরে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে সন একটি অভ্যুত্থান ঘটান। রাজা সিংহানুক তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর কাম্বোডিয়ায় মিত্র পক্ষের বাহিনী প্রবেশ করেছিল। ফরাসি সেনাপতি ক্লার্ক সনকে সরিয়ে দেন, বন্দি করেন এবং ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেছেন। পরে জনমতের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার তাঁর কারাদণ্ডের মেআদ কমিয়ে গৃহবন্দি করে রাখে। সন থাইল্যান্ডে চলে যান, সেখানে সরকারের সহায়তা নিয়ে বিদেশে অস্থায়ী কাম্বোডিয়া সরকার গঠন করেন। পাচ ছৌউনের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি ফ্রি কাম্বোডিয়া বা খমের আন্দোলন পরচালনা করেন। ইতিমধ্যে ফরাসিরা নামমাত্র স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করেছিল, অনেকগুলি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি কাম্বোডিয়াকে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে স্বয়ংশাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। তবে ফরাসি কমিশনার কার্যত সব ক্ষমতার অধিকারী রয়ে যান।

এসব চুক্তি থেকে কাম্বোডিয়া কিছু লাভবান হয়। কাম্বোডিয়া থাইল্যান্ডের কাছ থেকে দুটি প্রদেশ সিয়েমরিপ ও বাট্টামবাং ফেরত পায়, অন্য লাভ হয় কাম্বোডিয়ার। নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। খমেররা স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে কিছুটা অধিকার পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন খনি,

রেল, শুল্ক, বৈদেশিক সম্পর্ক ও কোষাগার সম্পূর্ণভাবে ফরাসি ইন্দো-চিন ফেডারেশনের হাতে রয়ে যায়। এসব শর্ত ও ব্যবস্থা শুধু বিরোধী ডেমোক্রেটিক দলের কাছে নয়, ফ্রান্স-পন্থী তরুণ রাজা নরোদমের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। ঠিক করে বলা শক্ত রাজা সিংহানুক কবে মত পালটান, তিনি জাতীয়তাবাদী হয়ে যান। পরবর্তী দুই দশকে সিংহানুক হয়ে ওঠেন দৈবানুগৃহীত রাজা, পার্ট নেতা ও বিশ্ব নেতা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর হস্তেক্ষেপের ফলে ফ্রি খমের পার্টির ১৫০০ সদস্য ও ছৌউন মুক্তি পান। এদের বেশিরভাগ ডেমোক্রেটিক দলে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে কাম্বোডিয়ার নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। তিনি জনসমর্থন পান এবং ফরাসিদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি রাখেন। এর উত্তরে ফরাসিরা তাঁকে আরো কিছু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ নভেম্বর ফরাসিরা কাম্বোডিয়াকে আরো স্বায়ত্তশাসন দেয়, তবে তারা বিদেশ, প্রতিরক্ষা, পুলিশ, বিচার প্রভৃতি বিভাগ নিজেদের অধীনে রেখেছিল। অজুহাত ছিল যুদ্ধ পরিস্থিতি।

ফরাসিদের এসব ব্যবস্থা খমেরদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভিয়েতমিন তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তারা স্বাধীন কাম্বোডিয়া রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করেছিল যদিও অস্থায়ীভাবে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে সন নাগোক থান দেশে ফিরে এসে ফরাসি শাসনের বিরোধিতা করেন। রাজা জাতীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। সন রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। রাজা ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকার ভেঙে দিলে জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজা তিন বছর আইনসভা ছাড়াই দেশ শাসনের ক্ষমতা দাবি করেন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সকলকে বিস্মিত করে রাজা সিংহানুক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। প্যারিস, ওয়াশিংটন ও নিউয়র্ক হয়ে ব্যাংককে আসেন, পশ্চিম কাম্বোডিয়ায় আত্মগোপন করেন। তিনি সৈন্যবাহিনী ও বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেন। সর্বত্র তিনি সহানুভূতি লাভ করেন, এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাও সহানুভূতি জানিয়েছিল। তবে ফরাসি সরকার বলেছিল কমিউনিস্টরা পরাস্ত না হলে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী লানিয়েল ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ফ্রান্স লাওসকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েও তাকে ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে রেখেছিল। কাম্বোডিয়ার সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি করে তাকে কার্যত স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও বিচার বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীঃ নভেম্বরে রাজা বিজয়ী বেশে রাজধানী নমপেনে প্রবেশ করেন। এটি কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা দিবস।

কাম্বোডিয়ার মতো লাওসে ফরাসি বিরোধী মনোভাব তেমন উগ্র ছিল না। ১৯৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে লাওসে ফরাসি বিরোধী হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ জাপানিরা ভিসি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, জাপানিরা লাওদের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিল, তবে প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ সাবাং বাথথানা ফরাসি প্রটেক্টরেট চুক্তি বাতিল করতে রাজি হননি। জাপানিরা অন্য যুবরাজ ফেট সারাথের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিল। সেই মতো ফের সারাথ সাবাং বাথথানার স্থলাভিষিক্ত হন। ঐ বছরের শেষে ফরাসি রেসিডেন্ট লাওসে ফেরার অভিপ্রায় জানালে নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্ষতা ফিরে পাবেন না বলে জানিয়ে দেন। রাজপরিবারের এই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়,

রাজা সিসাসভনে ভং বলেন যে লাওস তখনো ফরাসি প্রটেক্টরেট আছে, ফেট সারাথ তার ক্ষমতা হারান। এই পরিস্থিতিতে ফরাসি শাসন ও রাজার অধিকার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। রাজার আদেশে যুবরাজ ফেট সারাথ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বহিষ্কৃত হলে লাওসের স্বাধীনতার ঘোষণাটি বাতিল হয়ে যায়। এই ঘটনার পর গঠিত হয় কমিটি অব দ্য পিপল, অস্থায়ী আইনসভা ও একটি অস্থায়ী সংবিধান। ফ্রি লাও আন্দোলনের নেতারা একটি নতুন সরকার গঠন করেন, প্রধানমন্ত্রী হন ভিয়েনতিয়েনের প্রাক্তন গভর্নর ফায়া খাম্মাও। ফেট সারাথের দুই ভ্রাতা সুভন্না ফৌমা ও সভন্না ফং যথাক্রমে জনপরিষেবা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। রাজা ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অস্বীকার করলে আইনসভা তাঁকে পদচ্যুত করে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন রে। লাও ইসারাকে (ফ্রি লাল মুভমেন্ট) দেশের সব পশ্চিমি শিক্ষিত লোকেরা যোগ দিয়েছিল, এদের অনেকে ছিল রাজপরিবার ও অভিজাত পরিবারের লোক।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ফরাসিরা লাওসে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল। এরা লাও ইসারাক দলকে ভেঙে দেয়, ভিয়েনতিন দখল করে। রাজধানী লুয়াং প্রাবাং তাদের অধীনে স্থাপিত হয়। রাজার প্রত্যাবর্তন ঘটে, লাও ইসারাক পার্টির লোকেরা থাইল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে লাও ইসারাক দল কমিউনিস্ট প্রভাবিত থাইল্যান্ড থেকে বিদেশে অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন ফেট সারাথ, সুভন্না ফৌমা ছিলেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, সুভন্না ফং ছিলেন ক্ষুদ্র লাও ইসারাক বাহিনীর প্রধান। ছিলেন সুভন্না ফৌমা ফরাসিদের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী উদারনীতিবাদী নেতা পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজি হয়নি। এরফলে লা ফরাসীরা নাওসকে জাতীয়তাবাদীরাও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নরমপন্থীরা সৌভান্না ফৌমাকে সমর্থন করেছিল চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দেন সুভন্ন ফং। সৌভন্না ফং ভিয়েতনামিনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভিয়েতনামে গিয়ে তিনি প্যাথেট নামে গেরিলা সংস্থা গঠন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রানস ইন্দো-চিনের তিত দেশকে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল, লাওসকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দানের প্রস্তাব ছিল। লাওস তার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করতে পারতেন তবে এই বাহিনীর প্রধান হবেন একজন ফরাসি সেনাপতি। এই ঘোষণার পর লাও ইসারাক ভেঙে যায় যুবরাজ ফেট সারাথ ছাড়া আর সব নেতা দেশে ফিরে আসেন।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে যে সরকার গঠিত হয় সুভন্না ফৌমা হন তার প্রধান। এই সরকারের ওপর ফরাসি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। তবে ফরাসিরা এই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা লাওসকে আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলে লাওস ফরাসি ইউনিয়নের মধ্যে কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। তবে লাওসের গেরিলা বাহিনী পাথেট লাও এসবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, এরা ক্রমশ ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাথেট লাও তার প্রধান কার্যালয় লাও-ভিয়েতনাম সীমান্তে নিয়ে যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে লাওস কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, এই দলের সদস্যরা উত্তর-পূর্বের দুটি প্রদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেনিভা সম্মেলনের প্রাক্কালে লাওসের পরিস্থিতি এইরকম ছিল। ভিয়েতনামের সঙ্গে লাওসের ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছিল, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে তা চলতে থাকে। আশা করা হয় এক দেশের সমস্যার সমাধান হলে অন্যটির সমাধান হয়ে যাবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রথম পর্বের শেষ দিকে ভিয়েতমিন সৈন্যরা লাওস থেকে আক্রমণ চালাত। ইন্দো-চিনে ফরাসি ভাগ্য

নিয়ন্ত্রণ করেছিল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ। লাওস সীমান্তের কাছে এই যুদ্ধ হয়। জেনিভাতে ফ্রান্স ভিয়েতনাম থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সেইসঙ্গে লাওসও স্বাধীনতা লাভ করেছিল। জেনিভা চুক্তিতে পাথেট লাওয়ের সব আঞ্চলিক দাবি মেনে নেওয়া হয়নি তবে দুটি উত্তররের প্রদেশে এর আধিপত্য মেনে নেওয়া হয়। পাথেট লাও ঐ দুই স্থানে সমবেত হয়ে রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়। পাথেট লাও ভেঙে দিয়ে এর সদস্যদের সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।

১৬.৪.১০.৩ জননায়ক হো-চি-মিন ঃ শতাব্দীতে বিশ্বের ইতিহাসে যে অল্প সংখ্যক জননেতা মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন হো চি মিন তাঁদের অন্যতম (১৮৯০-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)। মাও সে তুঙ বা মহাত্মা গান্ধিরর সমপর্যায়ের জননেতা হলেন তিনি। গ্যারিবল্ডি, লুই কসুথ, ভি ভ্যালেরা বা পার্নেলের তিনি সমগোত্রীয়। দেশপ্রেম, পদত্যাগ, দেশের মুক্তি ও ঐক্যের জন্য সংগ্রাম অজানা নয়। হো চি মিনের মধ্যে সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। শোষিথএ উৎপীড়িত দেশবাসীর মুক্তি কামনায় তিনি নিঃস্বার্থ সংগ্রাম চালিয়ে যান। জীবনের শেষপর্বে সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও নিজ আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল ছিলেন। শেষ পর্বে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে মন দেন। শৈশব থেকে জীবনের শেষ অবধি দেশের মুক্তি ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সারা জীবন ধরে তাঁকে প্রবল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বের তিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন— ফ্রান্স, চাপান ও আমেরিকা। একই সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যে দেশ গঠনের কাজ চালিয়ে গেছেন। একজন ব্যক্তি যে দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন এবং দেশের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন, হো চি মিন তার প্রমাণ। সমগ্র ইন্দো-চিনের মানুষের কাছে হোচি মিন এক অতিপ্রিয় নাম।

চিন, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের মধ্যবর্তী স্থলে হল ইন্দো-চিন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই অঞ্চল ফ্রান্সের উপনিবেশ, উনিশ শতকের শেষদিকে সমগ্র অঞ্চলে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপিত হয়। সমগ্র-ইন্দো-চিনের জনসংখ্যা হল ২৫ মিলিয়ন, এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন হল ভিয়েতনামি। সমগ্র এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভিয়েতনামিরা ছিল অগ্রসর। উনিশ শতকের ভিয়েতনামিদের মধ্যে একই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা পশ্চিমি ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটে। চিনের দার্শনিক ও পণ্ডিত কাং-এ (Kang-yu-wei) চিনে সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়াস চালানো হলে ভিয়েতনামের বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হয়। গান্ধির রচনার সঙ্গেও পরিচয় হয়। ভিয়েতনামের প্রথম পর্বের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ফ্যান বোই চাও(Phan Boi Chau) ও ফ্যান চাও ত্রিন (Phan Chau Trinh) । জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ও চিন বিপ্লব ভিয়েতনামের উৎসাহ জুগিয়েছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে চিনের ক্যান্টনে স্থাপিত অ্যাসোসিয়াশেন রেস্টোরেশন অব ভিয়েতনাম (Association for the Restoration of Vietnam)।

ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত। ভূমির মালিকানা ছিল জমিদারদের হাতে, অধিকাংশ কৃষক ছিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। দেশের আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠেনি, শিক্ষিত মানুষদের উচ্চ সরকারি পদে নিয়োগ করা হত না। বিদেশি

শ্বেতকায় শাসক ও বাদামি স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জাতি বৈষম্য তৈরি হয়েছিল। দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোনো সুযোগ ছিল না। ভিয়েতনামি বুদ্ধিজীবীরা মনে করত শিক্ষা ও সভ্যতায় তার পশ্চিমিদের সমকক্ষ, তাদের অভাব শুধু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। প্রথমদিকরার জাতীয়তাবাদীরা এজন্য শিক্ষা বিস্তারের ওপর জোর দেনন্দ। শিক্ষা ও আধুনিকতার বিস্তার তারা চেয়েছিল, সেই সঙ্গে তারা স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা তুলেছিল। ভিয়েতনামে গড়ে ওঠে গুপ্ত বিপ্লব সমিতি। ফরাসি ঔপনিবেশিক পুলিশ এসব সমিতি কঠোরভাবে দমন করত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রেভোল্যুশনারি পার্টি অব ইয়াং আনাম নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পাঁচ বছর পর এই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নাম হয় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দো-চায়না।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দো-চায়নার নেতা হলেন হো চি মিন। উত্তর আনামের এক স্থানীয় কর্মচারীর সন্তান হো চি মিনের জন্ম ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক ফরাসি জাহাজে চেপে ইউরোপে যান, শুরু হয় তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। লন্ডনে কার্লটন রেস্টুরেন্টে তিনি পরিচারক হিসেবে কাজ করেন। প্যারিসে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী নেতা ফ্যান চাও ত্রিনের সহকারী হিসেবে কাজ করেন, এখানে ভিয়েতনামের জন্য এক সংস্থা গঠন করেন। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। প্যারিস অবস্থানকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে শান্তি সম্মেলনে আগত নেতৃবৃন্দের কাছে ইন্দো-চিনের মুক্তি চেয়ে তিনি প্রতিবেদন পেশ করেন। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে তিনি লাল পারিয়া (Le paria) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে তিনি মস্কো যান, বিশ্ব কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। মস্কোতে বিপ্লবী রণকৌশলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বারোদিন মিশনের সঙ্গে তিনি চিনে যান। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-চিন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, ঐ সময় দেশের ওপর মহামন্দার বয়ানক প্রভাবে সারাদেশে কৃষি অসন্তোষ দেখা যায়। ১৯৩১-৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল। এই অভুত্থান ঔপনিবেশিক সরকার দমন করেছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হো-চি-মিন দলের নাম পরিবর্তন করে অন্য কয়েকটি গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে গঠন করেন League for the Independance of Vietnam.

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান ইন্দো-চিন অধিকার করলে হো চি মিন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পটসডাম সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের পর ভিয়েতনামের উত্তরে জাতীয়তাবাদী চিন সরকার ও দক্ষিণে ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। সমগ্র ইন্দো-চিন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। হো চি মিন রাষ্ট্রসংঘের কাছে ফরাসি শাসন প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১৭° অক্ষাংশ রেখার উত্তরে উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন দল ভিয়েতমিন ক্ষমতা দখল করেছিল। সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও হো চি মিন জাতীয়তাবাদী শক্তিতে নেতৃত্ব দেন। বিশ্বের দ্বিমেরুকরণ ও ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল ইন্দো-চিনের ওপর। হো-চি মিন মনে করেন জাতীয় স্বাধনতা হল প্রয়োজন। তাঁর কর্মসূচীতে বুদ্ধিজীবী ও কৃষকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী চিনকে ভয় পেয়েছিল, সাম্যবাদের প্রসার রোদ করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল। কমিউনিস্ট আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিয়েন

ফু যুদ্ধের পর বিশ্বের সব প্রধান রাষ্ট্র জেনিভাতে মিলিত হয়ে ইন্দো-চিনে যুদ্ধবিরতি ঘটায়। জেনিভা চুক্তি ভিতেনামকে ১৭° অক্ষরেখায় ভাগ করেছিল। ফ্রান্স ইন্দো-চিন ত্যাগ করে চলে যায়।

উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিনের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়, দক্ষিণে বাও দাই সরকার টিকে থাকে। অল্পকাল পরে সেখানে নগো দিন দিয়েম ক্ষমতা দখল করেন। জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সংযুক্তি সম্ভব হয়নি। ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য আমেরিকার উদ্যোগে সিয়াটো (SEATO) গঠিত হয়। আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে হো চি মিনের মৃত্যুর পরও তাঁর সুযোগ্য ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট ও ভিয়েতকং যুদ্ধ চালাতে থাকে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তিতে এই দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়। ভিয়েতনামে গণপ্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, হো চি মিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেয়।।

হো-চি-মিন কখনোই গোঁড়ামিকে প্রশয় দিতেন না। তাঁর রচিত সংবিধানে ছিল ব্যক্তিগত অধিকার, সম্পত্তির অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। ভূমি সংস্কার করে তিনি লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের সঙ্গে মধ্য ভূমি বন্টন করে বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম প্রথা তুলে দেন। ভিয়েতনামের শিল্পে প্রগতির জন্য তিনি বিদেশি ঋণ নেন। অল্পকালের মধ্যে দেশে শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বেড়ে যায়। উত্তর ভিয়েতনাম খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল না। হো চি মিনের ভূমি সংস্কার, সমবায় খাবার প্রথা ও কৃষি ঋণ ব্যবস্থার জন্য দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়। দেশেকে স্বাধীনতা দেননি, দেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও স্থিতিশীলতা। এই দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক প্রথম জীবনে নিজের পরিচয় দিতেন 'দেশপ্রেমক নগুয়েন' (Nguyen the Patriot) বলে।সারাজীবন তিনি দেশপ্রেমিক রয়ে যান। দেশি ও বিদেশি পণ্ডিতরা তার রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করেছেন। সকলে তাঁকে ইন্দো-চিনের মহান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দেখিয়েছেন। ফ্রান্স শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতা হতেন। সাম্যবাদকে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। এর প্রতি তাঁর অবিচল আস্থাও তৈরি হয়। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল ইন্দো-চিনের শোষিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তি। এই লক্ষ্য থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি।

১৬.৪.১০.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Discuss the nationalist movement of Indo-China with special reference to Vietnam.

২) Describe the role of Ho-Chi-Min

পর্যায়-৫

ইন্দোনেশিয়া

১৬.৫.১১.১—সূচনা
১৬.৫.১১.২—ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা
১৬.৫.১১.৩—ডাচ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব
১৬.৫.১২.৪—ইন্দোনেশিয়ার জনবিন্যাস
১৬.৫.১৩.৫—জাভার চিনি শিল্প
১৬.৫.১৩.৬—সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১৬.৫.১১.১—সূচনা

বর্তমান পর্যায়ে আমরা ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস ও তার সঙ্গে দেশটির জনবিন্যাস ও দেশজ শিল্পের বিষয় আলোচনা করব।

১৬-২.১১.২ ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা

দঃ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বীপময় অঞ্চলে পর্তুগিজরা প্রথমে এসেছিল বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচার করতে। এরা ছিল ধর্মে ক্যাথলিক, এদের প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে এসেছিল। প্রোটেস্ট্রান্ট শক্তি হল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। এরা ছিল পর্তুগিজদের শত্রু। এরা মালয় এবং মালয়েশিয়া অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করেছিল, স্থানীয় শাসকেরা এদের স্বগত জানিয়েছিল। ডাচ ও ইংরেজদের মধ্যে ডাচরা ছিল বেশি আগ্রাসী। ডাচরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছিল। প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ছিল এদের লক্ষ্য। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাচরা প্রথম এখানে এসেছিল, তারপর আরো কয়েকটি অভিযান এখানে এসেছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এর মধ্যে ছিল ৭৬টি কোম্পানি। এটি পরিচালনা করত ১৭ জন ডিরেক্টর। ডাচ স্টেটস জেনারেলের একটি আইন বলে এই কোম্পানি গঠিত হয়। একুশ বছরের জন্য এই কোম্পানিকে বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের অধিকার দেওয়া হয়। তবে VOC.কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও বেশকিছু ওলন্দাজ ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য মালয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে।

ওলন্দাজ বণিকরা এখানে ঘাঁটি স্থাপন করে বাণিজ্য পরিচালনার কথা ভেবেছিল। বানটাম মালাক্কা ও জোহরের কথা ভাবা হয়। পরে বানটামের অধীন জাকার্তাকে সদর দপ্তর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। জে. পি. কোয়েন জাকার্তায় ডাচ অধিকার স্থাপন করেন, ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এর নামকরণ করেন বাটাভিয়া। হল্যান্ডকে প্রাচীন ভাষায় বলা হয় বাটাভিয়া। এখানে ডাচদের সদর দপ্তর স্থাপিত হবার পর এরা এখানকার মশলা বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের আগ্রহী হয়। ইংরেজদের সঙ্গে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ডাচরা সহযোগিতার চুক্তি করেছিল। ইংরেজরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে মন দিয়েছিল।

টিমোরে শুধু পর্তুগিজ শাসন বজায় ছিল। ইংরেজরা তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল। ডাচরা করমণ্ডল উপকূলে অধিকার স্থাপন করেছিল। পারস্য, এডেন ও লোহিত সাগরে ডাচ বাণিজ্য প্রসারিত হয়। হুগলিতে ডাচ বাণিজ্য কুঠি ছিল। জাভা ছাড়া ডাচরা মানুক্কা, মাকাসর, সেলেবেস অঞ্চলে মেনাদো পশ্চিম সুমাত্রার পফং ও মালাক্কা অধিকার করে নেয়। বোর্নিও, উত্তর সিলেবেস, সুমাত্রার অধিকাংশ ও উপদ্বীপ অঞ্চলে ডাচ শক্তি সম্প্রসারিত হয়। পূর্ববর্তী দ্বীপগুলিতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এগুলি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল।

ডাচদের বাণিজ্য সংগঠন পর্তুগিজদের চেয়ে অনেকবেশি মজবুজ ছিল। এই সংগঠন নিয়ে তারা মালুক্কা ও জাভা দখল করেছিল, অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলি দখল করেছিল। এসব অঞ্চলে মালাই, চিনা, ভারতীয়, আরব ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাবক ও বণিকরা বাণিজ্য করত। ডাচরা অনেক দেশের ওপর বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও এখানকার বাণিজ্য কাঠামোয় তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। ইউরোপীয় শক্তিগুলি এই অঞ্চলে টিকে ছিল। ডাচরা ছিল এই অঞ্চলে শ্রীবিজয়, মাজাপাহিত ও মালাক্কার উত্তরসূরি। ডাচদের আগমনের ফলে এখানকার রাজ্যগুলি খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মালাই জাভার বণিকরা বাণিজ্যে আধিপত্য হারিয়েছিল। মালাইরা ছোটোখাটো ব্যবসা করত, অনেকে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। জাভার লোকেরা সমুদ্র বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃষিতে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। সেলেবেসে ও মলুক্কাতে ডাচদের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিবাসীদের প্রায় ধ্বংসের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তবে ডাচরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করলেও ঔপনিবেশিক শাসন তখনো শুরু হয়নি। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় ছিল। অসংখ্য স্বয়ম্ভর গ্রাম ছিল এই অঞ্চলের অর্থনীতর ভিত্তি। দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পণ্য নিয়ে অল্প পরিমাণ বাণিজ্য চলেছিল। জাভা ও মলুক্কায় বাইরে ডাচ বণিকরা বাণিজ্যে অংশ নিত। ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ায় তখনো জন্ম হয়নি। শিল্পবিপ্লব এই দুই দেশের আসল স্রষ্টা। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পেনাং দ্বীপে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য এসে হাজির হয়।

এই অঞ্চলে ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামি সংস্কৃতি। অল্পকিছু লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেনি। ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাদের সামরিক শক্তি সাফল্য এনে দিয়েছিল। ভ্যান ল্যয়ার মনে করেন ডাচ শক্তি ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। বাণিজ্য ক্ষেত্রেও তেমন রদবদলের ঘটনা ঘটেনি। প্রচলিত বাণিজ্য কাঠামোর মধ্যে তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল। পুঁজিবাদের প্রতিনিধি হিসেবে ডাচ কোম্পানি কাজ করেনি। বণিকরা বাণিজ্য পুঁজি জুগিয়েছিল। ইন্দোনেশীয় সমজের ওপর ডাচ প্রভাব ছিল প্রান্তিক ভরকেন্দ্র ছিল দেশের মধ্যে বাইরে নয়। ঐতিহাসিক লেসি এশীয় বাণিজ্যের প্রচলিত ধারা বহমান ছিল তবে ডাচদের কারবার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ডাচরা মূলধন বিনিয়োগ করেছে, বড়ো বড়ো খামার গড়ে তুলেছে, ইন্দোনেশীয় শ্রমিক সেখানে কাজ পেয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জাভা থেকে সুমাত্রায় প্রসারিত হয়, দ্বীপাঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করা সম্ভব হয়। এভাবে উনিশ শতকে ইন্দোনেশিয়ার এসেছে নতুন রাজনৈতিক ঐক্য ও সামাজিক কাঠামো। লেগি মনে করেন সপ্তদশ দশকে নয়, উনিশ শতকে এখানকার সমাজের রূপান্তর ঘটেছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে থেকে এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল বলে তার ধারণা। ভ্যান ল্যয়ার মনে করেন ইন্দোনেশিয় ইতিহাস হিন্দু, ইসলামি ও ঔপনিবেশিক এই

তিনভাগে বিভক্ত নয়, এর শক্তি ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরে নিহিত। এখানে প্রাচ্য চরিত্র স্পষ্ট, পশ্চিমি প্রভাব তেমন স্পষ্ট নয়। কয়েকটি স্থানে ইউরোপীয় প্রভাব পড়েছে। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য প্রবাহ সক্রিয় রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা স্বতন্ত্র ভাবে প্রসারিত। সুদীর্ঘ তিনশো বছর ইন্দোনেশিয়া ডাচ প্রভাবাধীনে থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল স্থানীয় শক্তির হাতে। ডাচরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাসত্ত্বেও এখানে পুরোপুরি ওলন্দাজ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেনি। এর কারণ হল ইন্দোনেশীয় সমাজের আত্মশক্তি। এখানকার অভিজাত শ্রেণি ছিল দুর্বল, কিন্তু গ্রামীণ সমাজের প্রাণশক্তির অভাব ছিল না। দেশীয় সমাজের ওপর পশ্চিমি প্রভাব ছিল একটি পাতলা আস্তরণ। স্মেল জানিয়েছেন যে এখানে পরিবর্তন ছিল ধীর গতিতে, ঐতিহ্য ছিল শক্তিশালী ও দৃঢ়বদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ডাচরা জাভাতে ছিল সার্বভৌম শক্তি। এদের সংখ্যা ও সামর্থ্য ছিল সীমিত, তাসত্ত্বেও তারা এখানে সাফল্য লাভ করেছিল। দুটি কারণে তারা সফল হয়। এর প্রথম কারণটি হল সেই যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে ডাচরা ছিল নৌশক্তিতে বলীয়ান। পর্তুগীজ ও ইংরেজরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাস্ত হয়। মালয়েশিয়ার রাজ্যগুলি ছিল নৌশক্তির ওপর নির্ভরশীল, এরা বাণিজ্যপথগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। ডাচরা জাভাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে মালয়েশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। এখানকার একমাত্র স্থলশক্তি মাতরম তাদের আক্রমণের শিকার হয়। এখানকার ঘটনাবলি ও স্বার্থদ্বন্দ্ব ডাচ কোম্পানিকে একটি স্থলশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকে অন্যত্র তারা নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছিল। কিন্তু জাভাতে তার অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখানে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে তারা নিজেদের অবস্থান বজায় রেখেছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মশলা বাণিজ্য থেকে তাদের লাভ হত, একশো বছর পর ডাচ বাণিজ্যের পণ্য ছিল কফি ও চিনি। জাভার অধীনস্ত অঞ্চলে ডাচদের সাফল্যের দ্বিতীয় কারণ হল মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার আশন্ত, অস্থির অবস্থা। এখানকার পরিবেশ ও ঐতিহ্য এমন সব ঘটনার সৃষ্টি করেছিল যে। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান কোনো শক্তিকে বাধাদানের ক্ষমতা এদের ছিল না। এখানকার সমুদ্র তীবর্তী দেশগুলির স্থিতিশীলতা নির্ভর করত নৌশক্তি আয় ও নেতৃত্বের ওপর। এর কোনোটির অভাব হলে রাজশক্তির পতন হত। মধ্য ও পূর্ব জাভার কৃষিনির্ভর দেশগুলি অনেকবেশি স্থিতিশীল ছিল। এখানে কোনো রাজবংশ একশো বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। এসব রাজ্যে উত্তরাধিকার সমস্যা গৃহযুদ্ধ নিয়ে আসত, রাজ্যটি বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে যেত। উত্তরে ছিল বাণিজ্য নির্ভর অঞ্চল, দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিকতা স্বাতন্ত্র্য দাবি করেছিল। ডাচরা জাভাতে সফল হয়েছিল অস্ত্রবলে বা লোকবলে নয়। এজন্য বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে তারা সাফল্য পেয়েছিল। বাটাভিয়া জাভার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল দূরদৃষ্টির প্রভাবে ফলে। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য হল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ এই ধরনের নীতি অনুসরণ করত। জাভার রাজনীতির উত্থান-পতন এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যা ডাচদের শাসন প্রতিষ্ঠশায় সহায়ক হয়। হল্যান্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে জাভায় শাসন নিয়ন্ত্রণ করত। স্থানীয় গভর্নররা খেয়াল খুশিমতো নীতি নির্ধারণ বা অনুসরণ করতে পারত না। ইউরোপের আমলাতান্ত্রিক আইনানুগ বাণিজ্যিক কাঠামো দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ার ডাচ শাসনে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। জাভার বাইরে মলুক্কাস, মাকাসর, সেলেবিসে মেনান্দো আর পশ্চিমে সুমাত্রায় পাদং ও মালাক্কা তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ডাচ শাসকদের ক্ষমতার হেরফের হত। উত্তর সেলেবিসে বোর্নিও ছিল এমন একটি অঞ্চল। তাছাড়া সুমাত্রার বেশিরভাগ অঞ্চল ও দ্বীপুঞ্জ এরকম পরিস্থিতি ছিল। অন্যান্য দ্বীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ডাচ কোম্পানি তাদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ডাচ শাসনের সীমাবদ্ধতা ছিল। পতুগিজদের চেয়ে ডাচদের বাণিজ্য সংগঠন অবশ্যই উন্নততর ছিল। এজন্য তারা মলুক্কাসের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পেরেছিল, জাভায় নিজেদের অধিকার আরো সংহত করেছিল, অন্যত্র তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল। তবে জাভা ও মলুক্কাসের বাইরে তাদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। চিনা, ভারতীয় আরব, এশীয় বণিক ও মালয়েশীয়রা এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করতে পারত। ডাচরা স্থানীয় শাসকদের ওপর জোর করে বাণিজ্যিক চুক্তি চাপিয়েছিল, একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের দুর্গ ও নৌবহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইউরোপীয় বণিকরা উৎখাত করা হয়নি। পতুগিজরা টিমকরে রয়ে যায়, ইংরেজরা বানায় ১৬৮৪ খ্রীঃ সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে তাদের আরো কয়েকটি বাণিজ্য ঘাঁটি বানায় ১৬৮৪ খ্রীঃ ইংরেজরা বানটাম থেকে বিতাড়িত হয়। ডাচদের একচেটিয়া অধিকার অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন দেশের বণিকরা বাণিজ্য করেছিল। অষ্টাদশ শতকের পরিস্থিতি ছিল, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল দুর্বল কারণ এর বোঝা ছিল অধিক তার ওপর ছিল দুর্নীতি।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বে ডাচদের উপস্থিতি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যগত বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটায়নি, শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বড়ো ধরনের পরিবর্তন ছিল না। তবে স্থানীয় পরিস্থিতিতে অবশ্যই কিছু কিছু রূপান্তর ঘটেছিল। তারা পূর্বসুরি শ্রীবিজয়, মাজাপাহিত ও মালাক্কার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়েছিল। ডাচ শাসনের সবচেয়ে বড়ো ফল হল মালয়েশিয়ার দ্বীপময় রাজ্যগুলি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মালয়েশিয় ও জাভার অধিবাসীরা এই অঞ্চলের বাণিজ্যে আধিপত্য হারিয়েছিল। মালয়ের ক্ষেত্রে দেখায় যায় এরা ক্ষুদ্র বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল অথবা, ইউরোপীয়দের ভাষায় দস্যুবৃত্তি নিয়েছিল। ডাচরা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করলে জাভার লোকেরা বহির্বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জাভাতে তারা ডাচদের প্রজা-কৃষক হয়ে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন দক্ষিণ সেলেবিস মলুক্কাস অঞ্চলে তাদের নির্মম একচেটিয়া বাণিজ্য তাদের সর্বনাশ করেছিল, তারা ধ্বংস হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে জাভার ডাচ শাসনের সঙ্গে ১৫০ বছর পরে এর শাসনের তুলনা চলে না। এই অঞ্চলে ইউরোপীয়রা এসেছিল তবে আধুনিক ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়নি। এখানকার অর্থনীতি ছিল প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্বের। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে ছিল অসংখ্য স্বয়ম্ভর গ্রামসমাজ। যে বাণিজ্য ছিল তা অত্যন্ত সীমিত, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য নিয়ে এই বাণিজ্য চলেছিল। বিপুল আধুনিক ভোগ্যপণ্য নিয়ে বাণিজ্য ছিল না। শিল্পপণ্য উৎপাদনের বড়ো বড়ো কেন্দ্রও গড়ে ওঠেনি। পুরোনো ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মলুক্কাসের বাইরে তারা বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে বাণিজ্য করতে যেত। কোথাও উন্নয়নশীল ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। যেসব শক্তি এদের গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল তাদের আবির্ভাব ঘটেনি। শিল্পবিপ্লব উত্তর পরিস্থিতি শক্তি আধুনিক ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পত্তন

করেছিল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিট্রিশ কেদার তীরে পেনং-এ একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে এই অঞ্চলে শিল্প দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। দ্বীপময় অঞ্চলে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের সূচনা হয়।

১৬.১১.৫.৩ ইন্দোনেশিয়ার ডাচ ও ব্রিটিশ শাসনঃ ডেনডেলস ও র‍্যাফলসের শাসন (১৮০৮-১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থে লিখেছেন ‘বাতাবিয়ার পত্তন হয়েছিল ভারতবর্ষে যেভাবে মাদ্রাজ, বোম্বাই আর কলকাতার পত্তন হয়, ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ডাচরা এখানে একটি একটি গড় তৈরি করে। আর গড়ের নাম দেয় বাতাবিয়া—হল্যান্ড দেশের লাটিন নাম বাটাভিয়া। এই বাটাভিয়ার সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জে.পি, কোয়েনের নেতৃত্বে। মলুক্কার মশলা বাণিজ্যের ওপর তিনি একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন, ইন্দোনেশিয়ার উৎপন্ন পণ্য সংগ্রহের দিকে তিনি নজর দেন। কোম্পানির প্রভাব বিস্তারলাভ করে। এশীয় বাণিজ্যের এক বড়ো কেন্দ্র হল বাটাভিয়া। বানটামের বাণিজ্য সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, বাতরমে ডাচরা হস্তক্ষেপ করেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে এশীয় বাণিজ্যে লাভের মাত্রা কমেছিল, তাই ডাচ নীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। এজন্য তারা কফি চাষের ওপর জোর দেয়, ভূস্বামীদের কাছ থেকে কর হিসেবে কফি নিত। কফির উৎপাদন ও বণ্টন তদারকির জন্য ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। এভাবে জাভায় ইউরোপীয় শাসন কাঠামোর সূচনা হয়।

জাভায় শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তরে ছিল গ্রাম, শাসক ছিল নির্বাচিত গ্রামণী। শাসন কাঠামোর শীর্ষে ছিল ওলন্দাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল। জাভা কয়েকটি রেসিডেন্সি বা প্রদেশে বিভক্ত চিল, রেসিডেন্সির প্রধান ছিলেন রেসিডেন্ট। ইনি হতেন ডাচ কর্মচারী। তার নীচে ছিলেন রিজেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট। রিজেন্ট ছিল স্থানীয় ও বংশানুক্রমিক, তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট ছিল ডাচ। এর অধীনে ছিল কন্ট্রোলার, দেশি ও বিদেশি আমলাতন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের সেতু। এদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ফার্নিভাল লিখেছেন স্থানীয় মানুষজন মনে করত রেসিডেন্ট বড়ো ভাই, রিজেন্ট ছোটো ভাই। দেশীয় বিষয়ের দায়িত্ব এই ছোটো ভাইয়ের হাতে ছিল। ডাচ কর্মচারীরা বাণিজ্যিক স্বার্থ তদারকি করত। সাধারণভাবে এই শাসনকে বলা হত দ্বৈত শাসন। ফার্নিভাল একে পরোক্ষ শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। সারা অষ্টাদশ শতকে ডাচ কোম্পানির অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় অংশ নিত। অর্থের লোভে চিনাদের হাতে জম লিজ দেওয়া হয়। তবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়ার দেখানোর জন্য কোম্পানীকে ঋণ নিতে হয়। জাভাতে কোম্পানির বোর্নিও ও সুমাত্রার আধিপত্য ছিল না। জলদস্যুদের উৎপাত ছিল জাভার বণিকরা ন্যায্য বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়। জাহাজ পরিবহন ও উৎপাদনের ওপর ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ডাচ কোম্পানি প্রায় দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডাচ সরকার কোম্পানির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। এরপর থেকে ইন্দোনেশিয়া ডাচ সরকারের শাসনাধীনে স্থাপিত হয়।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ডব্লিউ. এইচ. ডেনডেলস (W. H. Daendels) জাভার গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। তার আগে রক্ষণশীল শাসক

ওভারস্ট্রেটেন (Overstraten), সিবার্গ (Siberg) ও নেদেরবুর্গ (Netherburgh) এখানে ক্ষমতায় ছিলেন। ইউরোপে তখন উদার বাণিজ্য নীতির মুক্ত হাওয়া বয়ে চলেছিল। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত একটি কমিটি জাভাতে সংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিল। এই সংস্কার প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি, শাসন ব্যবস্থার প্রচণ্ড দুর্নীতি ও উৎপীড়ন ছিল। নতুন গভর্নর- জেনারেল নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর লোক ছিলেন, সংস্কারের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাকে শাসিত জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে বলা হয়েছিল (to improve the lot of commonman)। ডেনডেলসের সংস্কারের কাজে তার সহযোগী ছিলেন মুন্টিঞ্জি (Muntinghe) পূর্ববর্তী লিবারেল গভর্নর ভ্যান হগেনডর্পের কাছ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ডেনডেলস ভূমির ওপর ২০ শতাংশ কর বসানোর প্রস্তাব করেন তবে এই প্রস্তাব বাস্তাবায়িত হয়নি। তিনি মনে করেন জাভার ভূসম্পত্তির ওপর ডাচদের মালিকানা রয়েছে। এই মালিকানার ধারণা স্থানীয় প্রধানদের জানা ছিল না। স্থানীয় জনগণের সেবা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলন (work under compulsion must take the place of regular taxes)। তিনি সারদেশে কফি ও তুলোর চাষের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। কৃষকদের পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা হয়। দরিদ্র জাভার কৃষক চিনাদের কাছে জমি বন্ধক রাখত, তিনি এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, অনেক বন্ধকি জমি তিনি উদ্ধার করেন। বেগার শ্রম প্রথার তিনি বিরোধী ছিলেন, এই প্রথা তিনি তুলে দিতে পারেননি, এর ওপর তিনি বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

ভ্যান হগেনডর্পের অনুসরণে ডেনডেলস বন বিভাগের পুনর্গঠন করেন। সামন্ত কর সব তুলে দেওয়া হয়। দেশে ডাক ও তার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। ডাইরেক্টর জেনারেল অব ট্রেডের পদটি তিনি তুলে দেন, এর স্থলে তিনি প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, চারজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অব ফাইনান্স ও চেম্বার অব অ্যাকাউন্টস গঠন করেন। বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীরা সকলে সরকারি কর্মচারী হয়ে যান। সমগ্র দেশকে ১০টি ফ্রিফেকচারে ব্রতা বলা হয়, স্থানীয় শাসকদের (রিজেন্ট) তিনি সরকারি অমেলা বলে গণ্য করেন। এরা হল স্থানীয় অভিজাত, প্রিফেক্টদের অধীনে থেকে হয়। এমন ব্যবস্থা হয়। জনগণের প্রদত্ত কর থেকে এদের বেতন দেওয়া হয়। শাসকদের সঙ্গে ডেনডেলস নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন। প্রত্যেক স্থাপন একটি করে আদালত গঠন করেন। সুরাবায়াতে একটি নতুন আদালত স্থাপন করা হয়। সার্কিট কোর্ট গঠন করে তিনি বিচার ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেন। ডেনডেলস মনে করেন তাঁর শাসন সংস্কার থেকে কোম্পানি বার্ষিক ৫০ লক্ষ গিল্ডার্স লাভ করবে। স্থানীয় আদলে আইন বজায় রাখা হয়।

বাস্তবক্ষেত্রে ডেনডেলসের সংস্কারগুলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৃষকরা ছিল উদাসীন, আর সরকারি কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। ইংল্যান্ড তার নৌবহর নিয়ে জাভায় ঘাঁটি গেড়েচিল, কার্যত জাভা অবরুদ্ধ ছিল। জাভার উৎপন্ন পণ্য কেনার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বণিক পাওয়া যেত না। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা এই বাণিজ্য পরিচালনা করত। মার্কিনিরা ছাড়া অন্য কোনো বিদেশি জাভাতে পণ্য কিনতে আসত না। এজন্য ডেনডেলস দুটি আর্থিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। চিনাদের কাছে জমি বিক্রি করে ডেনডেলস অর্থ সংগ্রহ করেন, আবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে পেপার কারেন্সি চালু করে তিনি আয় বাড়ান। বেগার প্রথার বিরোধী হলেও সামরিক কারণে তিনি এই প্রথা বজায় রাখেন। ডেনডেলস

সামরিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, সৈন্য ও নৌবাহিনী গঠন করেন, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ করেন, উপকূল বরাবর রাস্তা নির্মাণ করেন। নিরাপদ দূরত্বে রাজধানী সরিয়ে নেন। ডেনডেলস সংস্কার প্রবর্তন করে দেশের কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাননি, বরং কর্তৃপক্ষ তাঁর পদচ্যুতির ব্যবস্থা করেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জ্যানসেনস (Jansens) জাভার নতুন গভর্নর হয়ে আসেন। ঐ বছর আগস্ট মাসে ইংরেজরা জাভা দখল করে নেয়। ১৮১১-১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে জাভা ইংরেজ শাসনাধীনে ছিল। ঐ সময়কালে জাভার ইংরেজ গভর্নর ছিলেন টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস (১৮১১-১৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ডাচ ঐতিহাসিকরা মনে করেন তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসে ব্রিটিশ কর্তৃক জাভা বিজয় একটি মাইল ফলক, এক নতুন অধ্যায়ের শুরু (a turning oint in their colonial administration)। ডেনডেলসের মতো ক্ষমতা ও ব্যক্তি র‍্যাফলসের ছিল, সেই সঙ্গে ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ইংরেজ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাভার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত পালটে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন ??সাম্রাজ্যবাদ হল অমোঘ নিয়তি। ব্রিটিশ জ্ঞানদীপ্ত শাসন সকলের সেরা ডাচরা জাভাতে কোন পন্য আমদানি করত না বরং স্থানীয় কফি, তুলো চিনি, টিন প্রভৃতি রপ্তানিতে যুক্ত ছিল ইংরেজরা এখানে শিল্পজাত পন্য বাজারীকরণের জন্য এনেছিল। এজন্য স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নজর দিয়ে ছিল। ডেনডেলস ছিলেন অবরুদ্ধ অবস্থায়, র‍্যাফলস তুলনা স্বতন্ত্র। র‍্যাফলস ভারতও ইংল্যান্ডের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গয়ে তোলেন। তিনি সামারিক কারণে বেগার শ্রমকে স্বীকার করেন। নিমেই উদার দৃষ্টি দিয়ে তিনি ডাচ শাসনের পর্যালোচনা করে স্বীকার করেন জাভার প্রকৃত সংস্কার করেছিলেন ডেন জেনস।

শাসক হিসেবে র‍্যাফলস মুক্ত, অবাধ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করেন একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষতিকর, জনগণের উন্নতি না হলে ইংরেজ বাণিজ্যের উন্নতি হবে না। তিনি বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। স্থানীয় জনগণ যাতে তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে পারেন সেদিকে তিনি লক্ষ রাখেন। ভ্যান হগেনডর্প নীতি অনুসরণ করে তিনি স্থানীয় জনগণকে ভূমির মালিকানা দেন, শ্রমের মূল্য দেবার নীতি অনুরণ করেন। তিনি জমির ওপর খাজনা ধার্য করেন কারণ শাসক আসল ভূস্বামী। জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী খাজনা ধার্য করা হয়, তবে জমর জরিপের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। জমির মূল্য নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গ্রাম প্রধান শান্তি রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করত। গ্রামবাসীরা গ্রাম প্রধানদের নির্বাচিত করত। গ্রামপ্রধান ছিল সরকারের এজেন্ট। তবে ডাচদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রিজেন্টদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এই গ্রাম ও ভূমিব্যবস্থা র‍্যাফলসের শাসন, বিচার ও রাজস্ব সংস্কারের ভিত্তি ছিল। তিনজন সদস্য নিয়ে তিনি একটি পরামর্শ পর্ষদ গঠন করেন। বোর্ড অব ফাইন্যান্স ও চেম্বার অব অ্যাকাউন্টস তিনি তুলে দেন। এরস্থলে তিনি একটি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট গঠন করেন। উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমত রাখেন।

শাসন বিভাগে র‍্যাফলস আরো কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করেন। ডেনডেলস রিফেকচার তুলে দিয়ে ষোলটি রেসিডেন্সিতে দেশটিকে ভাগ করেন। অনেক নতুন জমি সরকারের অধীনে স্থাপিত হয়। রিজেন্সিগুলির নতুন নামকরণ হয় জেলা, রিজেন্ট হলেন জেলাশাসক। প্রত্যেক জেলাকে তিনি কয়েকটি ডিভিশনের ভাগ করেন প্রত্যেক ডিভিশনের অধীনে ছিল কয়েকটি গ্রাম। সরকারের সঙ্গে শাখিতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ডেলডেলসের বিচার ব্যবস্থা তাঁর কাছে জটিল ও মনে হয়েছিল। (at once complicated and confused) বিচার পদ্ধতি ছিল জটিল দেশি ও বিদেশিদের জন্য ভিন্ন আইন ও আদালত। র‍্যাফলসন ব্যয় বৃদ্ধি না করে বন্দরের অন্য আদালত ভেটো মামলার জন্য কোর্ট অব রিকোয়েস্ট?? কোর্ট তিনি তুলে দেন, বিচারকদের সংখ্যাকমান। এসব কোর্ট দেশি ও বিদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করত। সিভিল কোর্টে ডাচ অত্যাচার বন্ধ হয়, জেলের সংস্কার হয় জুরি বিচার প্রবর্তিত হয়। কোটয় অব সার্টি ছিল, রেসিডেন্টকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ছোটো মামলার বিচার জেলাশাসক, ডিভশলার অফিসার ও গ্রাম প্রধানের হাতে রয়ে যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় ইংরেজ শাসনের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। র‍্যাফলস উৎপাদনের ৪০ শতাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন। স্পেশাল কালেক্টর রাজস্ব ধার্য করত, গ্রাম প্রধান ডিভিশনাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করত। ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে স্থানীয় রিজেন্টদের কোনো অধিকার ছিল না। এজন্য তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকখানি হারিয়েছিল। র‍্যাফলস উৎপাদিত পণ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন, গ্রাম প্রধান জনগণের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন করে নগদে রাজস্ব আদায় করত। এর অবসান হয়। তিনি মনে করেন নতুন ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়বে, জনগণ সুখী হবে, সরকারি আয় বৃদ্ধি পাবে। র‍্যাফলস যাই ভাবুন না কেন, তার ব্যবস্থায় জনগণের ঋণগ্রস্থতা বেড়েছিল, তাদের তেমন আর্থিক উন্নতি হয়নি। র‍্যাফলস আরো কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি টিন খনি শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। শুল্ক আদায়ের জন্য নিলাম ব্যবস্থা তিনি বাতিল করে দেন। চিনাদের হাতে জুয়া থেকে শুল্ক আদায়ের দায়িত্ব দেন। অভ্যন্তরীণ অনেক শুল্ক তিনি তুলে দেন, দেশীয় প্রধানদের সঙ্গে নতুন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেন, এদের নামমাত্র স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেন। আসলে এদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে র‍্যাফলস তাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন।

র‍্যাফলস অতি দ্রুত সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেন, রক্ষণশীল কৃষক সমাজ এজন্য প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ডেনডেলস ও র‍্যাফলস উভয়ে ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংস্কারক। এদের সংস্কার সত্ত্বেও স্থানীয় শাসক জনগণের ওপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। র‍্যাফলসের ভূমি ব্যবস্থায় জমি চিনা মহাজনদের হাতে চলে যায়। জাভার জমি জরিপ করে রাজস্ব ধার্য করা হয়নি, অনুমানের ওপর নির্ভর করে রাজস্ব ধার্য করা হয়। অনেক স্থানে উৎপাদিত পণ্যে রাজস্ব নেওয়া হত। বেগার শ্রম প্রথা রয়ে যায়। রাস্তাঘাট, সরকারি আবাস রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। ডাচরা অর্থনৈতিক দাবি অস্বীকার করেছিল। রপ্তানি পণ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েছিল। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বেড়েছিল বাণিজ্য বেড়েছিল। জাভার বন্দর বিদেশি জাহাজ বেশি সংখ্যায় এসেছিল। তবে র‍্যাফলস তাঁর প্রয়াস সত্ত্বেও বাজেযে উদ্বৃত্ত দেখাতে পারেননি, তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে তার বাজেটে ১.৫৭ মিলিয়ন ঘাটতি ছিল। তবে তিনি সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে এনেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মনে করে র‍্যাফলস জাভাতে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ডাচরা জাভা দখল করেছিল, র‍্যাফলস এখান থেকে চলে যান।

জাভার শাসক হিসাবে র‍্যাফলস পুরোপুরি ব্যর্থ হননি। শাসন-ও বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারগুলি ডাচরা বজায় রেখেছিল। কিছু পরিবর্তনসহ তার গ্রাম ও রাজস্ব ব্যবস্থা টিকে ছিল। তার অন্যান্য সংস্কারও

বজায় ছিল। তার শ্রেষ্ঠ অবদান হল শাসন ক্ষেত্রে শাসিতের কল্যাণসাধন তিনি মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। জনগণের উন্নতি অবশ্যই ব্রিটিশ বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি শাসিত জনগণের ভাষা শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার দিকে নজর দেন। তাঁর শাসনকালে জাভার বরবদুর বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী শাসন ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের ওপর স্থায়ী উদারনৈতিক প্রভাব রেখেছিল। তার সম্পর্কে বলা হয় র‍্যাফলস শুধু ইংরেজ বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, ডাচ ও অন্যান্যদের হটিয়ে দেন। তার গ্রামভিত্তিক ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সমালোচনা হয়েছে। তবে বলা যায় একজন রাষ্ট্রনেতাদের উদার দৃষ্টি নিয়ে তিনি স্থানীয় শাসনের উন্নতিতে মন দেন। একজন আধুনিক ডাচ ঐতিহাসিক ম্যানসভেল্ট লিখেছেন যে আধুনিক ঔপনিবেশিক শাসন ডাচদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ডাচ শাসনের পরিবর্তন ঘটে, এই কাজটি করে টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস।

১৬১.৫.২.৪ ইন্দোনেশিয়ার জনবিন্যাস

হল্যান্ড অধীনস্থ পূর্ব ভারতীয়রা দ্বীপপুঞ্জের আর্থ-সামাজিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল বিপুল জনসংখ্যা এবং এর অসম বণ্টন। দেশটি ছিল বিশাল, জনসংখ্যা ছিল ততোধিক বিশাল। এখানে উন্নতি হার যেমন বেশি ছিল জনসংখ্যাও তেমনি বেশি ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব ভারতীয় ডাচ উপনিবেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক জাভা ও মাদুরাতে বসবাস করত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে এখানে জনবসতির ঘনত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জাভা ও মাদুরাতে প্রতি বর্গমাইলে বাস করত ৮১৯ জন মানুষ, জাভাতে এই সংখ্যা ছিল ৬৩২-১০০০ জন, বালিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল এর কাছাকাছি, প্রতি বর্গমাইল ৫০৩ জন। অন্যান্য দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব কম। সুমাত্রায় প্রতি বর্গমাইলে ৪৪জন বাস করত, সেলেবেসে বাস করত ৫৫ জন। মলুক্কাস থাকত মাত্র ১৮ জন, বের্নিওতেও মাত্র ১২ জন। পশ্চিম ইরিয়ানে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২ জন লোক বাস করত।

মনের ডাচদের আগমেরন আগে জাভায় লোকসংখ্যা বেড়েছিল কারণ আগ্নেয় শিলাজাত এই অঞ্চলে ছিল উর্বর, কৃষির অগ্রগতি ঘটেছিল উন্নততর, প্রযুক্তির জন্য। উনিশ শতক ও তার পরে এই অঞ্চলে লক্ষণীয়ভাবে জনসংখ্যা বেড়েছিল। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এক কারণ হল ডাচ সরকার এখানে উন্নতির প্রয়াস চালিয়েছিল। লক্ষ্য ছিল অবশ্যই শোষণ। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের কালচার সিস্টেমথেকে এই পর্বের শুরু। ডাচরা এখানে শাসন স্থাপন করলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় এসেছিল, জনগণ জীবিকার নতুন উপায়ের সন্ধান পেয়েছিল। চিনি শিল্পকে ঘিরে যে বিশাল কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উৎসাহিত হয়। অন্য কারণ হল জাভা হল একমাত্র অঞ্চল যেখানে আধুনিক পশ্চিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলা হয়। উনিশ শতকে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

যখন জাভায় লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল, অন্যান্য ডাচ অধিকৃত দ্বীপে লোকের অভাবে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। সুমাত্রা ও বোর্নিওতে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের আগে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিক ভারসাম্য ছিল না। মানুষ ছিল কম, প্রয়োজন ছিল বেশি। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে সম্পদ

ছিল বিক্ষিপ্ত, এজন্য আশানুরূপ উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়নি। যে অল্প লোকজন এসব দ্বপে বাস করত তারা কোনোমতে চাষবাস করে জীবনধারণ করত, এদের মধ্যে একাংশ আবার যুদ্ধ ও রোগের শিকার হয়। ডাচরা দ্বীপগুলিতে সম্প্রসারণে আগ্রহী হলে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করা হত। পশ্চিম সুমাত্রায় মেনাংকাবাউ উচ্চভূমিতে প্রথমে গোলমরচি ও পরে রাবার উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এখানে কালচার সিস্টেম শুরু হলে চিনি, চা তামাক, নারিকেল উৎপন্ন হয়, জমি ছিল উর্বর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর অবস্থিত। সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য কেন্দ্র গেড় ওঠে, এখানে তেল উৎপাদন শুরু হয়েছিল কারণ এখানে সঞ্চিত তেল ছিল। এই অঞ্চলে অন্য ঘনবসতি অঞ্চল হল উত্তর সেলেবেসে মিনাহাসা, দক্ষিণে মাকাসর। এই দুই স্থানে নারিকেল শিল্প ছিল। মালুক্কাসে অ্যামবন, সেরাম ও বান্দায় জমি ছিল উর্বর এবং বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপন্ন হত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছিল বালিতে। এখানে ডাচদের আগমনের আগে ঘনবসতি ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এখানে জমি ছিল খুব উর্বর, কৃষি ব্যবস্থা ছিল উন্নত। রাজনৈতিক কারণে জাভা থেকে এখানে লোকজন চলে এসেছিল। ডাচ সরকার এই অভিবাসনে উৎসাহ দিয়েছিল।

ডাচ শাসনের শেষ দেড়শো বছরে জাভা থেকে দ্বীপগুলিতে খুব কম লোক গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জনগণনায় দেখা যায় জাভাতে ১.৫ মিলিয়ন বিদেশি ছিল, এদের বেশিরভাগ ছিল চিনা। চিনারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু, এরা সংখ্যায় শুধু বেশি ছিল তাই নয়, এরা জাভার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ডাচরা জাভাতে এসে দেখেছিল চিনারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়ক তবে এদের বিদ্রোহী হবার সম্ভাবনা ছিল। কোয়েন (Coen) এই সিদ্ধান্ত নেন কোম্পানির উন্নতির জন্য চিনাদের সহায়তার প্রয়োজন। কোম্পানি ছিল বৃহৎ কারবারি, খুচরো বাণিজ্যে চিনারা ছিল অপরিহার্য। চিনারা এই অঞ্চলে তাদের জাঙ্ক নিয়ে বাণিজ্য করতে আসত। কোয়েন বাস্তব নীতি অনুসরণ করে চিনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। চিনারা চিনি শিল্পে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। চিনারা জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল, মহাজনি কারবার করে সচ্ছল হয়েছিল। ডাচ ও দেশি মানুষজন এদের পছন্দ করত না। সপ্তশ শতকে ফিলিপিনস থেকে বিতাড়িত হয়ে চিনারা জাভায় এসে বসতিস্থাপন করে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা বেশি ছিল। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাটাভিয়ায় ৮০,০০০ চিনা বাস করত, এদের অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, আবার ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে এরা অশান্ত হয়ে উঠত। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এরা বিদ্রোহ করত। এই বিদ্রোহে ৩০,০০০ চিনা প্রার হারিয়েছিল। তা সত্ত্বেও যারা টিকে ছিল তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চিনারা কোম্পানির হয়ে সরকারি রাজস্ব আদায় করত। এই কাজ করে চিনারা সচ্ছল হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে চিনারা ছিল ভাজার দেশি ও বিদেশিদের মধ্যে মধ্যস্থকারী। বেশিরভাগ চিনা জাভা ও মাদুরাতে বাস করত, অল্পকিছু বাংকা ও বেলিটুং খনিতে কাজ করত। পালেমবাং ও পশ্চিম বোর্নিওতে এরা সোনার খনিতে কাজ করত। চিনারা দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে কাজ করতে যেত, সেখানে শ্রমিকের অভাব ছিল। বালি, সুমাদ্রা, বোর্নিও ও সেলেবেসে চিনারা কাজ করতে যেত। নতুন চাষ জমিতে চিনারা কাজ পেত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে চিনা শ্রমিককে সরিয়ে জাভার শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, জাভাতে চিনাদের আগমন ছিল অবাঞ্ছিত, প্রযুক্তিগত উন্নতি এর একটি কারণ, দ্বিতীয় কারণ হল জাতীয়তাবাদী আবেগ, তা সত্ত্বেও

বছরে গড়ে ৩০,০০০ চিনা জাভায় আসত। চিনারা ছিল দুই শ্রেণীর এখানে যারা জন্মগ্রহণ করে, আর যারা চিন থেকে এসেছিল। হক্কিয়েন, হাক্কা ও তিউচি ছিল তিন প্রধান গোষ্ঠী। ডাচরা এদের সরকারি চাকরি দিত না, জমি কেনায় বাধা দিত। তবে দেশের সর্বত্র এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত তারা সাধারণত শহরে বাস করত, কৃষি, বাগিচা, খনিতে এরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। এদের অনেকে ছিল বণিক, মহাজন ও ফেরিওয়ালা। অনেক শিল্পে তারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করত, এদের মধ্যে অতিধনীরা জাহাজ, আর্থিক লেনদেন এবং বাণিজ্যিক পণ্যের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

জাভার দারিদ্র্যের এক বড়ো কারণ হল জনসংখ্যার ঘনত্ব। এর সমাধান হল ভিন্ন দ্বীপে জনসংখ্যাার একাংশের অভিবাসন, ভ্যান ডেভেনটার এটিকে তাঁর কল্যাণকর কাজের তালিকায় রাখেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে দক্ষিণ সুমাত্রায় জাভাবাসীদের পাঠানো হয়, ১৯০৮-১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেঙ্কুলিনে আরো কিছু সৈন্যকে পাঠানো হয়। বাণিজ্যিক পণ্য চাষ শুরু হলে দ্বীপগুলিতে জাভাবাসীদের অভিবাসন এগোতে থাকে। তবে দ্বীপগুলিতে ভালো উপনিবেশ স্থাপনের জায়গা তেমন ছিল না। এসব অঞ্চলে মহামারি হত, অভিবাসীরা এসব স্থান পছন্দ করেনি। অনেকে কাজের উদ্দেশ্যে অন্য দ্বীপে চলে যেত তবে সরকারি উদ্যোগে অভিবাসন তেমন সফল হয়নি। ১৯৩০ দশকে সরকার বিভিন্ন দ্বীপে জাভার লোকজনকে নিয়ে ঘন বসতি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। একটি কলোনাইজেশন ও এগ্রিকালচারাল ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল কমিশন ফর এমিগ্রেসন কলোনাইজেশন এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল। অভিবাসীরা দলে দলে দ্বীপগুলিতে বাস করতে থাকে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ বছরে গড়ে ১০০,০০০ লোক দ্বীপ গুলিতে চলে যেত। সুমাত্রা, সেলেবেস ও পূর্ব বোর্নিওতে উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এখানে অভিবাসীদের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি ২.৫ একর জমি কৃষির জন্য পেয়েছিল। জাভায় বছরে ৬ লক্ষ লোক বেড়ে যেত, মাত্র ১ লক্ষ দ্বীপ অঞ্চলে চলে যেত। ডাচ সরকার বছরে ২.৫ লক্ষ লোককে দ্বীপে পাঠাতে পারে কিন্তু এত লোকের বসবাসের যথেষ্ট জায়গা ছিল না, অনেক স্থলে বসতির ঘনত্ব বেড়েছিল।

১৬১.৫.৩.৫ - জাভার চিনি শিল্প (১৯০০-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)

১৯০০-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল হল জাভার ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্ব। জাভার অর্থনৈতিক উন্নতি ও ঔপনিবেশিকদের সুবিধার জন্য শাসকগোষ্ঠী কালচার সিস্টেম, লিবারেল ও এথিক্যাল নীতি অনুসরণ করেছিল। এসব নীতি জাভার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারেনি, ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ অবধি জাভার জনগণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত রয়ে যায়। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়েনি এবং শিক্ষার প্রসার হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষে জাভায় মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত ছিল। জাভার অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর, ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্ব আধুনিক শিল্প স্থাপনের চেষ্টা হয় কিন্তু বাজারের অভাবে শিল্পায়নের অগ্রগতি ঘটেনি। প্রথম থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ অবধি জাতা কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঊনিশ শতকের শেষদিক থেকে ইউরোপের বাজারে চাহিদা আছে এমন সব পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর নেওয়া হয়, এরকম পণ্য হল চিনি, রাবার, কফি, চা, তামাক ইত্যাদি।

জে. এইচ. বিক (Boeke) লিখেছেন যে ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক অর্থনীতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল

এর দ্বৈত সত্তা। এর একদিকে ছিল আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানি দপ্তর, ব্যাংক ও বৃহদাকার বাণিজ্যসংস্থা, অপরদিকে রক্ষণশীল, সনাতন, পরিবর্তনবিমুখ খোরাকি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি। জাভার অর্থনৈতিক জীবনের অন্য বৈশিষ্ট্য হল জমির ওপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জাভার জনসংখ্যা ২৮.৭৪ মিলিয়ন, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯ মিলিয়ন, বার্ষিক বৃদ্ধির হার হল প্রায় সাত লক্ষ। পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চহার দেখা যায় না। ১৯২৯-৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা ১৫ শতাংশ হারে, আর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছিল মাত্র ৩.৫ শতাংশ হারে। জাভার গ্রামীণ কৃষকের চাষ জমির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতি কৃষক পরিবারের অধীনে গড়ে ২.৫ একরের বেশি জমি ছিল না। চাষ জমির খণ্ডীকরণ জাভার নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। জাভায় নতুন বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। হল্যান্ডে পুঁজির অভাব ছিল না, জাভাতে আখ চাষের মতো আবহাওয়া ও জমি ছিল। ঔপনিবেশিকরা জেনারেল সিন্ডিকেট অব সুগার প্রডিউসারস, ইউনিয়ন সুগার প্রডিউসারস গঠন করে চিনি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিল। জাভাতে চিনির কাঁচামাল আখের উৎপাদন ব্যয় কম, শ্রমিক ছিল সস্তা। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে ডাচ উৎপাদকেরা আখের চাষ ও চিনি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল।

ডাচ ঔপনিবেশিক শাসকরা পুঁজিপতিদের চিনি উৎপাদনের জ্যন কাঁচামাল আখের উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। জাভার জমি আখ চাষের উপযোগী, আর এই জমি ছিল গ্রাম সমাজের হাতে। সরকারের অধীনেও কিছু জমি ছিল। সরকারি জমি লিজে নিয়ে বা গ্রামের জমি চাষির কাছ থেকে লিজ নিয়ে আখের চাষ বসানো যায়। ১৮৯৫ ও ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে আইন করে বাগিচা মালিকদের চুক্তি করে কৃষি জমি লিজ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই চুক্তিগুলি হত সাধারণত ৫-১২ বছরের জন্য উপনিবেশিকরা যাতে স্থানীয় কৃষকদের প্রবঞ্চনা করতে না পারে সেজন্য আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। আবার কৃষকদের খাজনা দিয়ে আড়াই বছরের জন্য জমি লিজ নিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল (Minimum Rent Regulation)। তবে উপনিবেশিকরা এসব জমির চেয়ে সরকারি জমি লিজ নিতে বেশি আগ্রহী ছিল যে হেতু সেখানে কৃষকদের অধিকার ছিল না। এসব আইন গ্রাহ্য নিয়মবিধির বাইরেও উপনিবেশিকরা জমি সংগ্রহ করে আখের চাষ বসিয়েছিল। ব্যক্তিগত চুক্তিতে খাজনার ব্যবস্থা ছিল কম তবে জমির নিরাপত্তা ছিল না, কৃষক যে কোন সময় তার জমি ফিরিয়ে নিতে পারত।

জাভার জন্য শাসকরা চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এজন্য কৃষক বা বাগিচা মালক কাউকে জলকর দিতে হত না। বগিচা মালিক ও কৃষক একই ধরনের জমি চাষ করত, শুধু কৃষকের ওপর জলকর চাপানো সম্ভব ছিল না। জাভাতে ভূমিকরের হার ছিল খুব কম, খুব কম রাজস্ব দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি জমি বাগিচার জন্য পাওয়া যেত। ঔপনিবেশিক ডাচ রাষ্ট্র বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই শতকে বার্ষিক সেচ বৃদ্ধির হার ছিল ৬-৫৬ শতাংশ। প্রচুর বৃষ্টিপাত, উর্বর জম ও উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা আখ চাষের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। আখ চাষ এত লাভজনক হয়েছিল যে শুধু ঔপনিবেশিকরা নয়, স্থানীয় কৃষকও আখ চাষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে দ্রুত আখের উৎপাদন বেড়ে চলেছিল। ডাচ বাগিচা মালিকদের পুঁজির অভাব ছিল না। ডাচ ব্যাংকগুলি থেকে অল্প সুদে তারা পুঁজি সংগ্রহ করতে পারত। স্থানীয় কৃষক চিনা

বা আরব মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে, মাসিক ১০-১৬ শতাংশ হারে টাকা ধার করত। সরকার গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করে শোষণমূলক ঋণ ব্যবস্থা থেকে কৃষকদের রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ডাচ বাগিচা মালিকদের পরিকল্পনা মতো চিনি শিল্পের উন্নতি হয়। জাভাতে ১৮০টি বড়ো ধরনের চিনি শিল্প ছিল। এদের অধীনে ছিল দুই লক্ষ হেক্টর জমি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে চিনি শিল্পগুলিতে মোট উৎপাদন ছিল ৭,৪৪,০০০ মেট্রিক টন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৯.১৫,০০০ টন। এই চিনি বেশিরভাগ রপ্তানি হয়ে যেত ভারত, চিন, জাপান ও আফ্রিকায়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জাভা মোট ২৮,৩৮,০০০ মেট্রিক টন চিনি রপ্তানি করেছিল। ঐ সময়ে রপ্তানি চিনির মূল্য ছিল ২৫,৪২,৭১,০০০ গিল্ডার। সাধারণত গ্রামের চুক্তিবদ্ধ জমিতে এপ্রিল-জুলাই মাসে আখের চাষ বসানো হত, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আখ সংগ্রহ করা যেত। আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষক আখ ওঠানোর পর ঐ জমিতে ধান বা অন্য বাণিজ্যিক পণ্য যেমন বাণিজ্যিক পণ্য যেমন তামাকের চাষ বসাতে পারত। প্রতি বছর একই জমিতে আখের চাষ বসানো যেত না। কৃষক চাষ ও 'ফসল' ওঠানোর জন্য মজুরি পেত। অবসর সময়ে কৃষক চিনি কারখানায় উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মহামন্দার আগে চিনি শিল্পে নিযুক্ত ছিল ৬০,০০০ শ্রমিক, অস্থায়ীভাবে কাজ করত আরো ৭০,০০০ লোক। কুলিদের আগাম দিয়ে কারখানায় কাজ করানর জন্য চুক্তি করা হত। চিনি কারখানায় কাজ করে একজন শ্রমিক দৈনিক ৪৫-৫০ সেন্ট পেত, কাজের চাপ না থাকলে মজুরি কমে হত ৩০ সেন্ট। মাঠে চাষের কাজ করলে একজন কৃষক দৈনিক এক গিল্ডার উপার্জন করত। মহিলা ও শিশুরা কারখানায় খোঁজ করে দৈনিক ১০-২৩ সেন্ট পেত।

একটি বড়ো চিনি শিল্পের বার্ষিক ব্যয় হত প্রায় ৩ মিলিয়ন গিল্ডার, এর মধ্যে ২ মিলিয়ন ছিল মজুরি, ১.৩০ মিলিয়ন ছিল খাজন। হেক্টর প্রতি আখের গড় উৎপাদন ছিল ১০০-১৬০ কুইন্টাল। জাভার চিনি শিল্প মহামন্দা পর্ব (১৯২৯-৩৪ খ্রিস্টাব্দ) বেশ স্থিতিশীল ছিল, বার্ষিক উৎপাদন বেড়ে চলেছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিনি শিল্পে বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়। হল লিখেছেন যে এই সময় থেকে চিনি শিল্পে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা থেকে এই শিল্প আর রেহাই পায়নি। ১৯৩২ খিস্টাব্দের পর ঔপনিবেশিক সরকারের 'ক্রাইসিস নতি' এই শিল্পকে সহায়তা দিয়েছিল, এই শিল্প খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। তবে চিন, ভারত ও জাপানে চিনি শিল্প গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাজারে জাভার চিনির চাহিদা কমে যায়। জাভার গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব বাজারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কখনো স্থাপিত হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসক জাভার অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। জাভার কৃষক সমাজ পরিবর্তনবিমুখ ও রক্ষণশীল হয়ে যায়। বাগিচা মালিক ও আমলাদের বাধাদানের ফলে স্থানীয় উদ্যোগে আখ চাষ সম্প্রসারিত হয়নি। ইউরোপীয় মাপকাঠিতে বিচার করে বলা যায় জাভার কৃষকের অবস্থা মায়ানমারের কৃষকের চেয়ে খারাপ ছিল না। হলের মতে, জাভার কৃষকের নিম্নমানের জীবনযাত্রার কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, ডাচ শাসকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর সব প্রয়াস এজন্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

জাভার চিনি শিল্পে ডাচ পুঁজির প্রাধান্য ছিল (Dutch capital dominated the Sugar industry) । এখানে বিদেশি ব্রিটিশ, জার্মান ও সুইস পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও ডাচরা চিনি শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল। সম্ভবত শাকসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এই শিল্প থেকে অ-ওলন্দাঝ বিদেশিদের

দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মহামন্দার আগে এখানে বিদেশি পুঁজি ছিল ৫০০০ মিলিয়ন গিল্ডার। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ ছিল অ-ওলন্দাজরে। এরা এই পুঁজি তেল, রাবার ও চা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। চিনি শিল্পে বিদেশি প্রতিযোগিতার অভাবে দেশি উৎপাদক কৃষক ও শ্রমিক লাভবান হয়নি।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে কার্যত জাভার চিনি শিল্পে সংকটের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ইউরোপে বিট চিনির উৎপাদন এর এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ হল চিনি শিল্পের প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে কোনো গবেষণার ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীর বাজারে চিনির দাম কমতে থাকে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জাভার চিনি শিল্প পঞ্চম স্থানে চলে যায়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের চিনি উৎপাদকরা ব্রাসেলসে মিলিত হয়ে বিট চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জাভার চিনি উৎপাদকরা নিজেদের সমস্যা মেটানোর জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিল। এই সংগঠনগুলি (ASSF & VISP) নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জাভার চিনি শিল্পে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, অল্পবিস্তর সম্প্রসারণও ঘটেছিল।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিনি শিল্পের পতন শুরু হয়, বিশ্ব বাজারে চিনির দাম ভয়ংকর ভাবে নেমে যায়। উৎপাদন অর্ধেক হয়ে যায়, দুই-তৃতীয়াংশ কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়। বিশ্ব চিনি উৎপাদক সংস্থা চাদবোর্ন পরিকল্পনা (Chadbourne) অনুযায়ী উৎপাদন কমিয়ে বাজার দাম স্থিতিশাল রাখতে চেয়েছিল। তবে জাভার চিনি উৎপাদকরা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেনি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ডাচসরকার NIVAS নামক একটি কেন্দ্রীয় চিনি সংস্থা গঠন করে উৎপাদন কমিয়েছিল, অনেকগুলি চিনি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে জাভায় চিনির বার্ষিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ লক্ষ টন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে আন্তর্জাতিক চিনি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপন করা হয়। যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে বিভিন্ন দেশ চিনি মজুত করতে শুরু করলে চাহিদা বাড়ে। তবে জাভার চিনি শিল্পের মৌল সমস্যা রয়ে যায়, এটি হল এই পণ্যের নিজস্ব স্থায়ী বাজার ছিল না।

১৬.৫.১৩.৬ - সম্ভাব্য প্রশ্নবলী

1) Describe the Colonial Impact on Indonesia.

2) What do you know about the Suger Industry of Java?

পর্যায় - ৬

১৬.৬.১৪.১ - সূচনা

১৬.১৪.৬.২ - ডাচ কালচার সিস্টেম ও তার তাৎপর্য

১৬.১৪.৬.৩ - ডাচ লিবারেল নীতি

১৬.৬.১৫.৪ - ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৬১.৬.৬.৫ - স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার নেতা সুকর্ণ

১৬১.৬.৬..৬ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১৬.১৪.৬.১ - ডাচ কালচার সিস্টেম ও তার তাৎপর্য

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জাভার ডাচ গভর্নর জোহানেস ভ্যানডেন বশ (Johannes Vanden Bosch) যে ঔপনিবেশিক নীতি প্রবর্তন করেন তা কাল্টিভেশন সিস্টেম বা কালচার সিস্টেম নামে পরিচিত।৩ এর প্রকৃত পরিচয় হল সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি ব্যবস্থা। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিনীর যুদ্ধের শেষে ডাচরা জাভা ফিরে পেয়েছিল, তবে জাভার অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি চলেছিল। ১৮২৫-৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাভার স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ডাচদের লড়াই হয়, এজন্য ডাচ শাসকদের প্রচণ্ড অথনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম হল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এই যুদ্ধ ঘোষণার জন্য হল্যান্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। হল্যান্ডের এই অর্থনৈতিক সংকটের দিনে অভিজ্ঞ প্রশাসক বশ জাভায় নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। তার আগে উক্ত শাসকরা শাসকরা দুটি বিকল্পের কথা ভেবেছিলেন—একটি হল স্থানীয় কৃষকদের স্বাধীনভাবে শস্য উৎপাদনের অধিকার দেওয়া, অপরটি হল বিদেশি পুঁজিপতিদের জাভার কৃষিতে অর্থ লগ্নির অধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। প্রথম প্রকল্পটি ছিল র‍্যাফলস্ ক্যাপেলেনের (Raffles-Capellen), দ্বিতীয়টি দু বুসের (du Bus)।

জি. জি. ই. হল লিখেছেন যে কালচার সিস্টেম হল জাভার ডাচদের পুরোনো জবরদস্তি সরবরাহ নীতির এক পরিবর্তত ও পরিমার্জিত রুপ। ধরে নেওয়া হয় জাভার কৃষক তার জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার জানে না। সেজন্য সরকার তার জমির একাংশে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কৃষকের দেয় ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে তার উৎপন্ন পণ্য নেবে। যদি উৎপন্ন পণ্যের দাম ভূমি রাজস্বের বেশি হয় কৃষক বাড়তি টাকা পাবে। যদি দেয় রাজস্ব উৎপন্ন পণ্যের বেশি হয় কৃষক সরকারি কোষাগারে বাকি রাজস্ব জমা দেবে। এইসব রপ্তানি পণ্য ডাচ জাহাজে করে হল্যান্ডে নিয়ে যাওয় হবে, সেখান থেকে পৃথিবীর বাজারে তা সরবরাহ করা হবে। হল্যান্ডে উৎপন্ন শিল্পপণ্য উপনিবেশের বাজারে একচেটিয়াভাবে বিক্রিকরা হবে।

বশ জাভাতে যে কালচার সিস্টেম প্রবর্তন করেন হল তার নটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (১)

সরকার কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করে ইউরোপের বাজারে সরবরাহযোগ্য পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করবে। ধান জমির একাংশে এই পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। (২) পণ্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ হবে 'দেশের' মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ। (৩) ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী পণ্য উৎপাদনের জন্য ধান চাষের চেয়ে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। (৪) যে জমিতে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপন্ন হবে তা হবে করমুক্ত। (৫) উৎপন্ন ফসল জেলায় পাঠানো হবে। উৎপন্ন ফসলের দাম ভূমিকরের বেশি হলে বাকিটা কৃষককে ফেরত দেওয়া হবে। (৬) কৃষকের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও ফসল নষ্ট হলে তা হবে সরকারের দায়। (৭) দেশি শ্রমিক তার প্রধানের অধীনে কাজ করবে, ফসল বসানো, তোলা, পরিবহন, স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কাজ তদারকি করবে ইউরোপীয়রা। (৮) শ্রমিকদের চার ভাগে ভাগ করা হবে—একদল ফসল ফলাবে, অন্যদল ফসল তুলবে, তৃতীয় দল ফসল পরিবহনের কাজ করবে, চতুর্থ দল কারখানায় কাজ করবে। যদি মুক্ত শ্রমিক না পাওয়া যায় চতুর্থ শ্রেণির শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। এসব শ্রম ছিল বাধ্যতামূলক। (৯) বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে কৃষককে ভূমিকর থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা ধরে নেওয়া হবে ফসল পাকলে কৃষকের দায় শেষ হবে। ফসল ওঠানো ও পন্য রপ্তানিযোগ্য করার জন্য পৃথক চুক্তির প্রয়োজন হবে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এই কালচার সিস্টেম চালন হয়, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা চলেছিল।

ভ্যানডেন বশ জাভাকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। চিনি ও নীল শিল্পে তিনি কালচার সিস্টেম প্রথম প্রবর্তন করেন, পরে কফি, চা, তামাক, সিংকোনা, গোলমরিচ ও তুলো চাষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য ভ্যানডেন বশের নির্দেশ ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর অসঙ্গতি ছিল। তিনি পরিসংখ্যানের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলেন, এই সব পরিসংখ্যানে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। এজন্য নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কালচার সিস্টেমের অধিকর্তা বি. জে. এলিয়াস (B. J. Elias) এই বাবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় ও দেশি আমলাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। অন্য অসুবিধা হল কৃষকের দক্ষতার অভাব, প্রযুক্তির অভাব, বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশে এই নীতি প্রয়োগের অসুবিধা, এবং জাভার মানুষের নতুন কিছু গ্রহণের মানসিক অক্ষমতা। পশ্চিমি জগতে তৎকালে প্রচলিত উদারনৈতিক অবাধমুক্ত মতবাদের সঙ্গে কালচার সিস্টেমের মিল ছিল না। ফলে সমালোচনা করেছিল। বশের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি।

জি. কে. এম. টেট (Tate) লিখেছেন কালচার সিস্টেমের লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে বলা যায় এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। কালচার সিস্টেম তার সব লক্ষ্য পূরণ করেছিল (In terms of its aims, the culture system must be adjudged a great success)। ডাচ ঐতিহাসিক দ্য ওয়াল (de Waal) জানিয়েছেন যে জাভা হল্যান্ডকে দিয়েছিল প্রচুর সম্পদ। ভ্যানডেন বশের কালচার সিস্টেমকে বলা হয় হল্যান্ডের লাইফ-বেল্ট। হুল লিখেছেন যে বশ জাভাকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে বাঁচানোর জন্য কালচার সিস্টেম প্রবর্তন করেন। অল্পকাল পরে এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হল্যান্ডের অর্থনৈতিক সুরক্ষা। আরো পরে এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জাভার অথনৈতিক ক্ষতির বিনিময়ে হল্যান্ডের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বশের কালচার সিস্টেমের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে যায়। জাভার আয় বয়ে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে হল্যান্ড প্রতি বছর গড়ে ৯ থেকে১৫ মিলিয়ন গিল্ডার লাভ

করেছিল। ১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হল্যান্ড জাভা থেকে লাভ করেছিল ৭৮১ মিলিয়ন গিল্ডার। এই অর্থ দিয়ে হল্যান্ড তার জাতীয় ঋণ পরিশোধ করেছিল, রেলপথ তৈরি হয়, আর অমস্টারডাম হয়ে ওঠে পৃথিবীর অন্যতম মূলধনী বাজার। কালচার সিস্টেমের ফলে লাভবান হয় নাগাল্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি (N.H.M.)। এই কোম্পানি জাভার রপ্তানি পণ্য পরিবহন করে বাজারজাত করার অধিকার পেয়েছিল।

যদিও বশ মনে করেন এই ব্যবস্থায় কৃষকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে, বাস্তবে তা হয়নি। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ব্যবস্থায় জোরজবরদস্তি শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্টকে মাথাপিছু দুই গিল্ডার মূল্যের রপ্তানি পণ্য সরবহার করতে বলা হয়। কৃষক স্বাধীনভাবে উদ্বৃত্ত কফি বিক্রি করতে পারত না। বশ ধান চাষের চেয়ে বেশি শ্রম দেবার বিরোধী ছিলেন। তবে কফি, নীল ও চিনি চাষের জন্য বেশি শ্রমের প্রয়োজন হয়। এই শ্রম তারা জোর করে আদায় করেছিল। লাভের দিকে তাকিয়ে সরকার এসব অগ্রাহ্য করেছিল। দেশি ও ইউরোপীয় পরিদর্শক বাড়িতি উৎপাদনের ওপর কমিশন পেত, এজন্য কৃষকের ওপর অত্যাচার হয়। এরা কৃষকের সেরা জমিতে রপ্তানি পণ্য চাষ করতে বাধ্য হয়েছিল। সরকারি পণ্যের চাষ আগে বসাতে হত, এজন্য ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৪৮-৫০ সময়কালে মধ্য জাভা অঞ্চলে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সাধারণ মানুষ দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। স্ট্যাপেল মনে করেন কালচার সিস্টেমে পণ্য উৎপাদনকারী জমিতে ভূমিকর নিষিদ্ধ হলেও কার্যত ভূমিকর আদার করা হত।

টেট জানিয়েছেন যে কালচার সিস্টেমের ফলে জাভার কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বিপুলভাবে প্রসারিত হয়। চিনি, কফি ও নীলের উৎপাদন বড়ে, এইসব পণ্য জাভার অর্থনীতিতে স্থায়ী আসন নিয়েছিল। অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন দারুণভাবে উৎসাহিত হয়, এগুলি হল চা, তামাক, গোলমরিচ, দারুচিনি, তুলো, রেশম ইত্যাদি। তবে এসব পণ্য উৎপাদনে তাৎক্ষণিক সাফল্য আসেনি। পরবর্তীকালে অর্থনীতিকে মজবুত করেছিল। কালচার সিস্টেমের ফলে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সারা দেশে কয়েকটি জলসেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়। এর পরোক্ষ ফল হল ব্যাংক, বিমা, বন্দর ও কারখানার সম্প্রসারণ। জাভার লোকসংখ্যা বেড়ে যায়, বাজার, জমি ও লবণ থেকে সরকারের আয় বাড়ে। চালের উৎপাদনও বেড়েছিল, বিদেশি বস্ত্রের চাহিদাও বেড়েছিল। এজন্য অর্থনীতিবিদরা মনে করেন সামগ্রিকভাবে জাভার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল।

লিবারেল ডাচ ঐতিহাসিকরা মনে করেন কালচার সিস্টেম থেকে জাভার কোনো লাভ হয়নি (The Indies gained nothing)। জাভার যেসব অঞ্চলে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় (যেমন পূর্ব জাভা) শুধু সেসব অঞ্চলে সমৃদ্ধি এসেছিল। জাভার ৫.৫ শতাংশ অঞ্চলে মাত্র ২৫ শতাংশ লোক এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। সামগ্রিক ভাবে সারা দেশের সমৃদ্ধি আসেনি। জাভার বাইরে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র। এই প্রথা সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নতির স্তরে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। জাভাতে দুর্ভিক্ষ হলে কালচার সিস্টেমের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সরকার বাধ্য হয়ে ধান চাষ বাড়িয়েছিল। রপ্তানি পণ্য সরকারি গুদামে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষককে। এই গুদামগুলি ছিল জমি থেকে অনেক দূরে।, ৫০-৬০ মাইল দূরেও এই গুদাম থাকত। এজন্য কৃষক এটাকে অত্যাচার বলে মনে করত। তবে কালচার সিস্টেমের ফলে ইউরোপীয় আমলা, স্থানীয় প্রধান প্রিয়ায়ি (Priyayi) ও চিনারা লাভবান হয়। চিনারা এজেন্ট,

কনট্রাক্টর ও মিল মালিক হিসেবে কাজ করেছিল।

জাভার কালচার সিস্টেমের সবচেয়ে বড়ো সমালোকচকরা হল উদারনীতিবাদী ও জাভার সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদীরা। ফার্নিভাল মনে করেন র‍্যাফলস-মুন্টিঙ্ঘি যে স্বাধীন উদ্যোগী কৃষকের কথা ভেবেছিলেন তারা শেষ অবধি মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে যেত। আবার দু বুসের ইউরোপের পুঁজিপতিদের দিয়ে চাষ করানোর প্রকল্পে লাভবান হত বিদেশিরা। টেট লিখেছেন যে, কালচার সিস্টেমের ফলে জাভার অর্থনীতিতে দ্বৈতসত্তার আবির্ভাব হয়। বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন ঘিরে গড়ে ওঠে ব্যাংক, বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ, নতুন প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও পরিচালন ব্যবস্থা, অন্যদিকে ছিল প্রথাগত চাষ-আবাদ,। প্রথমটিতে জাভার মানুষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। এই অর্থনীতির লভ্যাংশের সামান্য অংশ তারা পেত। এই অর্থনীতি ছিল পুঁজি-নিবিড় ও সমৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি ছিল শ্রম-নিবিড়, এখানে জাভাবাসীদের ভূমিকা মুখ্য কিন্তু আর্থিক উন্নতি হয়নি, বরং দারিদ্র্য বেড়েছিল (It also marked the growth of a basic dichotomy in the colonial economy of the Indies, between the sphere of export crop production dominated by western capital, management and techniques on the one hand, and that of production for native consumption on the other. The first sphere where the Javanese played a purely passive role and received a diminutive share of the profits, which accrued, was capital-intensive and prosperous, the second was labour-intensive and one in which the Javanese was the central figure as he sank into deeper poverty)। ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা সত্ত্বেও এখানকার সমাজ ছিল সনাতন, গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক ও পরিবর্তন বিমুখ। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইন্দেনেশিয়ার সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এখানেও দ্বৈত্য সাংস্কৃতিক পাশাপাশি বহমান ছিল।

১৬.১৪.৬.৩- ডাচ নিবারেল নীতি (১৮৭০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ)

বিশ শতকের তিরিশের দশকে ডাচ শাসকরা ইন্দোনেশিয়ায় কালচার সিস্টেম প্রবর্তন করেছিল। এই কৃষি ব্যবস্থায় এখানকার কৃষি জমিতে বাধ্যতামূলকভাবে বাণিজ্যিক পণ্য চা, কফি, নীল, চিনি, তামাক প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। কালচার সিস্টেমে ডাচদের পক্ষে খুব লাভজনক ছিল কিন্তু নানা কারণে হল্যান্ডের উদারপন্থীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। মধ্য উনিশ শতক থেকে হল্যান্ডে উদারপন্থা জোরদার হয়ে উঠেছিল। হল্যান্ডের পার্লামেন্ট ঔপনিবেশিক সাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল। ঔপনিবেশের কাউন্সিলকে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করেন। হল্যান্ড আইন করে দাস প্রথা তুলে দিয়েছিল। আইনসভার উদারপন্থী সদস্যরা কালচার সিস্টেমকে আধা-দাস প্রথা বলে উল্লেখ করেছিল। তারা দাবি করেছিল ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মানুষ ও ডাচরা স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মে উদ্যোগ নেবে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইন্দোনেশিয়ায় ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে পার্লামেন্টের সদস্যরা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। রক্ষণশীলরা বাধ্যতামূলক শ্রমনীতিকে সমর্থন করেন। কয়েকটি মানবতাবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী অবাধ শ্রম নীতিকে সমর্থন করেছিল। দুইজন বিশিষ্ট ডাচ বুদ্ধিজীবী মুক্তপন্থীদের সমর্থন করেন। এদের একজন হলেন এডওয়ার্ড ডাওয়েজ ডেকার। ইনি দীর্ঘকাল জাভাতে কাজ করেছিলেন। কালচার সিস্টেমে কৃষকের

ওপর যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয় তাঁর উপন্যাস *ম্যাক্স হ্যাভেলারে* তার নিখুঁত চিত্রটি তুলে ধরেন। এই উপন্যাসটি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।[৫] লিবারেল দল কালচার সিস্টেমের বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করেছিল। জনগণ তা সমর্থন করেছিল। আইজ্যাক ভ্যানডের পুট্টি তাঁর পুস্তিকায় কালচার সিস্টেমের বিরোধিতা করেন। তিনি কৃষকের ওপর সরাসরি কর স্থাপন করে তাদের মুক্ত করতে বলেন। ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ও শ্রমকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের কাছে উন্মুক্ত করতে বলা হয়।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের লিবারেল প্রধানমন্ত্রী থরবেক (Thorbecke) ভ্যানডের পুট্টিকে উপনিবেশ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় লিবারেল দল-অবাধ, মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছিল, তিন দশক ধরে তা চলেছিল । ডাচদের লিবারেল নীতি সমকালীন ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা গ্ল্যাডস্টোনের লিবারেল নীতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। গ্ল্যাডস্টোন শাসিত জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি দায়িত্ব শাসককে নিতে বলেন। ডাচ লিবারেল নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। কৃষকের ওপর সরাসরি কর বসিয়ে ভূমি ও শ্রমিক কালচার সিস্টেমের বন্ধন থেকে মুক্ত করা ছিল লক্ষ্য। সরকারি কর্মচারীরা কালচার সিস্টেমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর কমিশন পেত। এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় লিবারেল নীতি অনুযায়ী কোনো কৃষকের জমির এক-পঞ্চমাংশের বেশি সরকার ব্যবহার করতে পারবেন না। বেসরকারি উদ্যোগ গঠন করে বণিক ও শিল্পপতির পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রচলিত প্রথাগত ভূমি সংক্রান্ত অধিকার সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ইন্দোনেশিয়ার চাষযোগ্য জমি বিদেশিদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছিল, তারা কয়েক বছরের জন্য লিজ নিতে পারবে। ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীরা লিজ হোল্ড জমিতে বাগিচা বসানোর অধিকার পেয়েছিল। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে চুক্তি করতে পারবে। কৃষকের জমি মাত্র ৩-৫ বছরের জন্য লিজ নেওয়া যাবে, সরকারি জমি ৭৫ বছরের জন্য লিজ নেওয়া যাবে।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জীবনধারণের উপযোগী জমি যাতে লিজ দেওয়া না হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত আইনে ইন্দোনেশীয় শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন ও কাজের শর্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দ্য ওয়াল (de Waal) কৃষি ও চিনি উৎপাদন সম্পর্কিত যে কৃষি আইন চালু করেন তাতে উদারনৈতিক পর্বের সূচনা হয়। তবে লিবারেল নীতি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কালচার সিস্টেম শেষ হয়ে যায়নি। অপেক্ষাকৃত অলাভজনক গোলমরিচ, মশলা, নীল, চা, চামাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কালচার সিস্টেম উঠে যায়। লাভজনক চিনি শিল্পে কালচার সিস্টেম ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল, কফির ক্ষেত্রে তা চলেছিল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তবে উল্লেখ্য এসব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ চালু ছিল।

লিবারেল পর্বে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কালচার পর্বকে ছাড়িয়ে যায়। বণিক ও পুঁজিপতিদের উদ্যোগে এই পর্বে লাভ হয় অপরিমিত। মাত্র পাঁচ বছরে ১৮৭০-৭৫ খ্রিস্টাব্দ) লাভ দাঁড়িয়েছিল ৬৬ মিলিয়ন গিল্ডার, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে তুলনায় দশ বছরে বাগিচা মালিকদের লাভ দাঁড়ায় তিনগুণ। চিনি ও তামাক শিল্প সবচেয়ে প্রসারিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চিনি উৎপাদন বেড়ে হয় দুই গুণ। বৃহৎ খামার ও বাগিচা অর্থনীতি ইন্দোনেশিয়ার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। পরিবর্তনের একটি কারণ হল নতুন শস্য

চাষের ব্যবস্থা। নতুন কৃষিজ পণ্য হল পাম অয়েল, কোকা, নারকেল, কাসাভা ও কাপোক। ১৮৭০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি দু'গুণ বেড়েছিল, আমদানি বেড়েছিল চার গুণ। আমদানি-রপ্তানির হিসেব-নিকেশের পর নীট লাভ দাঁড়ায় ৮১ মিলিয়ন গিল্ডার। নতুন আমদানি পন্যের তালিকায় ছিল যন্ত্রপাতি, রেলের সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সার। কয়লা, তেল ও রবারের উৎপাদন শুরু হয়।

অনেকে মনে করেন এই অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতির আসল কারণ হল ব্যক্তিগত উদ্যোগনীতির সার্থক রূপায়ণ। এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিনি, চা, তামাকের উৎপাদন বেড়েছিল, তেমনি সরকারি উদ্যোগে কফির উৎপাদন বেড়েছিল। অভাবনীয় সমৃদ্ধির এক কারণ হল সুয়েজ পথ (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) উন্মুক্ত হলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যেক লেনদেন বেড়ে যায়। হল্যান্ডের জাতীয় জীবনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আগে ধনী পরিবারের নিষ্কর্মা ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিরা ইন্দোনেশিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে আসত। লিবারেল নীতির রূপায়ণ শুরু হলে শিক্ষিত উদ্যোগী হল্যান্ডবাসী এখানে এসেছিল। প্রতি বছর গড়ে এক হাজার ওলন্দাজ এখানে চলে আসতে থাকে। শাসন বিভাগের ইউরোপীয় শাখা সম্প্রসারিত হয়। দেশীয় অভিজাতবর্গের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে কৃষককুলকে বাঁচানোর জন্য আইন তৈরি হয়। কালচার সিস্টেমে স্থানীয় অভিজাত প্রিয়ারি ছিল প্রধান, নতুন লিবারেল ব্যবস্থায় এরা হলেন শ্রমিকের ঠিকাদার।

লিবারেল ব্যবস্থায় পতিত জমিতে চাষ বসেছিল, খনি, তেল, রাবার শিল্প শুরু হয়। রাস্তাঘাট, বন্দর, পোতাশ্রয় ও রেলপথ প্রসারিত হয়। ডাচ লিবারেল নীতি হল আসলে অবাধ মুক্ত laissez faire নীতি, ক্লিফোর্ড গিরত্জ (Geertz) একে একটি নতুন নীতি বলেননি, বলেছেন নতুন পদ্ধতি, ঔপনিবেশিক নীতি রূপায়ণের এক পন্থা। এই লিবারেল নীতির লক্ষ্য ছিল এক —ইউরোপের বাজারে ইন্দোনেশিয়ার কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করা। কালচার সিস্টেমের মতো লিবারেল নীতির মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা হয়। চিনি শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বেড়ে দাঁড়ায় ৯৭ শতাংশ, জলসেচ, যোগাযোগ ও রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ছোটো পুঁতিপতিরা হটে যায়, বড়ো শিল্পগোষ্ঠী শিল্পবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিল, ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির দ্বৈত সত্তা আরো শক্তিশালী হয়। লেগি (Legge) ক্লিফোর্ডের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি, তিনি মনে করেন ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু হলে ইন্দোনেশিয়ার নতুন ধরনের বাগিচা অর্থনীতি গড়ে ওঠে। নতুন বিনিয়োগকারীরা বাগিচা পণ্যকে শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। হল্যান্ডের পেশাদার ম্যানেজাররা বাগিচা শিল্প দুইই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল। বৃহদকার কারবারে বিপুল অর্থ লগ্নিকরা একথা ঠিক নয়। বিপুল লাভ হয়েছিল কারণ জমি ও শ্রম দুইই ছিল সুলভ।

ফলাফলের বিচারে লিবারেল নীতি কালচার সিস্টেম থেকে পৃথক ছিল না ব্যক্তিগত উদ্যোগ সরকারি উদ্যোগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লিবারেল নীতির ব্যর্থতার এক কারণ হল এই নীতির প্রবক্তারা একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে যা ছিল পরস্পর বিরোধী। তারা ইন্দোনেশিয়ার মানুষকে শোষণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন আবার সেই সঙ্গে দেশটিকে ব্যক্তিগত পুঁজির অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করেন। তবে বিদেশি বাণিজ্যের সঙ্গে এখানকার মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাফল্য সত্ত্বেও জনকল্যাণমূলক কাজের উন্নতি হয়নি। স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেনি, যদিও

এটি ছিল লিবারেল নীতির অঙ্গ। লিবারেল পর্বে ইউরোপীয়দের সম্পদ বেড়েছিল। ইন্দোনেশীয়দের অবস্থার উন্নতি হয়নি। আমদানি-রপ্তানি ও বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বাড়েনি। সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বয়ংশাসিত গ্রামগুলিতে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এসব কারণে নব্বই এর দশকে হল্যান্ডে ঔপনিবেশিক নীতি পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল।

১৬১.৬.৫.- ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জনসমর্থিত সারেকাৎ ইসলাম দল গঠিত হয়। জর্জ এম. কাহিন সহ গবেষকরা জানিয়েছেন, ডাচ শাসনের গোড়া থেকে ইন্দোনেশিয়ায় অস্পষ্ট অপরিণত জাতীয়তাবাদের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেছেন, ১৮২৫-৩০ খ্রিস্টাব্দের জাবা যুদ্ধ (Jawa war) বিশ ও তিরিশের দশকে পশ্চিম সুমাত্রায় সংঘর্ষ এবং উনিশ শতকের শেষে অটজে অঞ্চলে ডাচ শাসনের বিরোধিতা সবই ছিল জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট প্রকাশ। এসব হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তবে এগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি, দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে ওঠেনি, গণসমর্থন লাভ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দেয় ঐতিহ্য নির্ভর উচ্চবর্গের প্রিয়ায়ি ও সান্ট্রি শ্রেণির মানুষজন। জাভার অভ্যন্তরে ভূমি-নির্ভর অভিজাতরা ছিল প্রিয়ায়ি, এদের পেশাদারি কোনো দক্ষতা ছিল না, জন্মসূত্রে এরা ছিল জেলা ও উপজেলার শাসক বা রিজেন্ট। এদের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করত। ডাচ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই প্রথাগত শাসন পালন করত না। স্যান্ট্রি সম্প্রদায় ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষ, পেশায় বণিক। এদের ওপর বিদেশি প্রভাব পড়েছিল, সংস্কারপন্থী ইসলাম এদের প্রভাবিত করেছিল। ডাচ সরকার ১৮৯০ দশকে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল, এথিক্যাল পলিসির বাস্তবায়ন এদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক ডাচ সরকার দুই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। প্রথম শ্রেণির বিদ্যালয়ে অভিজাত প্রিয়ায়িদের সন্তানরা শিক্ষা পেত, দ্বিতীয় শ্রেণির স্কুলে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রামীণ স্কুল স্থাপন করা হয়, গ্রামবাসীরা স্কুল গৃহ নির্মাণ করে দিত, সরকার দিত শিক্ষক, পাঠ্য পুস্তক ও নির্মাণের দ্রব্যসমূহ। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এগ্রিকালচারাল সেকেন্ডারি স্কুল স্থাপিত হয়, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভেটিরিনারি স্কুল, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আইন স্কুল। এসব প্রতিষ্ঠানের স্নাতক, যারা অল্পকাল লেখাপড়া শিখে তাছেড়ে দেন এবং যারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন তারা সকলে মিলে গঠন করেছিল নতুন উচ্চবর্গ। এরা অনেকে পেশাদার বা আধা-পেশাদার। অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সরকারি বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, দেশি মানুষদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিল এই শিক্ষিত সমাজ গঠন করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের সরকার ইউরোপীয়দের স্থলে শ্রেণি মানুষজনকে সিভিলিয়ান পদে নিয়োগ করেছিল। শ্রেণি মানুষজনকে কিছুটা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পেয়েছিল। এসব সংস্কার ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। এসব নীতির প্রয়োগে বৈষম্য দেখা যায়। বর্ণের কারণে বৈষম্য করা হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল একই পদে নিযুক্ত হয়ে ইউরোপীয় ও ইন্দোনেশীয় একই বেতন পেত না। একজন ইন্দোনেশীয় যুবক কেরানি পদে নিযুক্ত হয়ে মাত্র ২৫ গিল্ডার বেতন পেত, একজন ইউরোপীয় পেত ৬৩ গিল্ডার। স্কুলে একজন দেশি ছাত্রকে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়[৭] ছাত্রের চেয়ে বেশি

বেতন দিতে হত। গোড়ার দিকে ডিগ্রি অর্জন করে চাকরি পাওয়া যেত, পরে প্রিয়ায়ি দেখেছিল শাসন বা শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই।

সান্ট্রি শ্রেণির মানুষজন আরো বেশি ক্ষুব্ধ ছিল। এরা আশা করেছিল এথিক্যাল পলিসির ফলে চাষ বাড়বে, বাণিজ্যিক পণ্য উৎপন্ন হবে, বাণিজ্য বাড়বে। নতুন আইন পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ডাচ কোম্পানিগুলি ও চিনারা অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল। এজন্য সারেকাৎ ইসলাম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে চিনাদের আক্রমণ করেছিল। অর্থনীতির সর্বত্র চিনাদের অবাধ বিচরণ ছিল, শুধু পুঁজি নিবিড় ক্ষেত্র যেমন ব্যাংকিং, জাহাজ, তেল ও অন্যত্র তাদের তেমন প্রভাব ছিল না। চিনারা কাঁচামাল, শ্রমিক, উৎপাদন, বন্টন নিয়ন্ত্রণ করেছিল বুটিক ও বস্তশিল্পে। এখানে জাভা ও সুমাত্রার মানুষের প্রাধান্য ছিল। চাল, নারিকেল, টাপিয়োকা ও কাপোকের প্রক্রিয়াকরণ চিনাদের হাতে ছিল। চিনাদের হাতে ছিল পুঁজি, অভিজ্ঞতা, বাণিজ্যিক যোগাযোগ, এজন্য ইন্দোনেশীয় বণিকরা প্রতিযোগিতায় এদের কাছে পরাস্ত হত। স্থানীয় মানুষজনের অভাব-অভিযোগ ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদ গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ারদিকে প্রিয়ায়ি শ্রেণি অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিক্ষার বিস্তার ঘটলে মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন বোধ জাগ্রত হয়। ডাচ শাসনাধীনে তাদের অধীনস্থ অবস্থা তাদের বেদনার কারণ হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তারা সুক্ষ্মভাবে জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরি করেছিল। ডাচদের ভয়ে এরা প্রকাশ্যে জাতীয়তাবাদী প্রচার করতে পারেনি। উল্লেখ্য ডাচ শাসনের বিরোধী হলেও এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ পশ্চিমি ভাবধারার বিরোধী ছিল না। এরা ধরে নিয়েছিল পশ্চিমি শিক্ষা তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির সহায়ক হবে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে একজন রিজেন্টের কন্যা রাদেন আজেগ কারতিনি মহিলাদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই মহিয়সী মহিলা অল্প বয়সে মারা গেলেও দেশি কারতিনি মডেলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এসব মহিলা স্কুলের ছাত্রীরা পরবর্তীকালে বুদি উতোমো নামক এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর অর্থ হল উচ্চ প্রয়াস। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কারতিনির সহকর্মী ড. ওয়াইদিন সুদিরা উসাদা বুদি উতোমো স্থাপন করেন। শিক্ষা ও অর্থনীতির উন্নতি ঘটিয়ে জাতির উন্নতি ঘটানো ছিল এর লক্ষ্য। এই সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে ছিল অভিজাত, সিভিলিয়ান, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা। এদের বেশিরভাগ এসেছিল শাসক প্রিয়ায়ি শ্রেণি থেকে। এই আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল কারণ এদের দাবির মধ্যে পশ্চিমি ও ইন্দোনেশীয় সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারতে এই ধারা পঞ্চাশ বছর ধরে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারাকে সমর্থন করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা বুদি উতোমো প্রভাবিত ছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় সারেকাৎ ইসলাম যার দাবির মধ্যে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা বিষয়। এর প্রধান দাবি ছিল অর্থনৈতিক। এর কর্মসূচির চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমস্যা। চিনারা অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সমগ্র বাণিজ্য এরা নিয়ন্ত্রণ করত, এজন্য ইন্দোনেশিয়ার বণিক সম্প্রদায় এদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। ইসলামের আদর্শবাদ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একসূত্রে বেঁধেছিল। গ্রামের মানুষের আশা পূরণ করতে পারেনি এথিক্যাল পলিসি, গ্রামীণ নেতারা তাদের

দুর্দশা দূর করতে পারেনি, সেজন্য তারা সারেকাৎ ইসলামের দ্বারস্থ হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে সারেকাৎ ছিল যথার্থ সংগঠন। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের উগ্র প্রচার ও ধর্মান্তকরণ পছন্দ করেনি। সারেকাতের প্রথম সমর্থকরা হল বণিক ও নিম্নবর্গের প্রিয়ায়ি সম্প্রদায়ের লোক। এরা শিক্ষায় ছিল অগ্রগামী, বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত এবং সামাজিক অবস্থানে মধ্যবিত্ত। ইন্দোনেশিয়ার ইসলাম ছিল নরমপন্থী, আধুনিক ভাবাপন্ন, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। জাতীয়তাবাদের বাহন হয়ে উঠেছিল এই সংগঠন।

এই সারেকাৎ ইসলামের নেতা ছিলেন গণবিমোহিনী শক্তির অধিকারী ওমর সৈয়দ জোক্রেসিনোটো। জনগণের কাছে তিনি 'রাতু আদিল' (ন্যায়পরায়ণ রাজকুমার) নামে পরিচিত ছিলেন। জনগণ আশা করেছিল ওমর সৈয়দ তাদের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করবেন। দলে দলে কৃষকরা তাকে চোখে দেখা ও স্পর্শ করার জন্য চলে আসত। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঐতিহ্যবাহী প্রবাদপ্রতিম বীরনায়কের নাম। পরবর্তী দুই দশক ধরে এই ব্যক্তির গৃহ ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র। সুকর্ন হলেন তাঁর শিষ্য ও জামাতা। সারেকাৎ ইসলামের লক্ষ্য ছিল সীমিত - বাণিজ্যিক মনোভাব বৃদ্ধি করা এবং বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার করা। ইন্দোনেশিয়ার মানুষের অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি ঘটানো ছিল এর অন্য লক্ষ্য। চিনাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করা ছিল এদের লক্ষ্য। খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণ বন্ধ করা ছিল অন্য লক্ষ্য। ডাচ সরকারের উৎপীড়নের ভয়ে এই সংগঠন সব কাজ প্রকাশ্যে করত না, অনেক কাজ ছিল গোপন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর সদস্য সংখ্যা দুই মিলিয়ন, এর জাতীয় ও রাজনৈতিক চরিত্র ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে এই সংগঠনের দুর্বলতা হল বহু ধরনের মানুষ এর সদস্য ছিল, লক্ষ্য ও পদ্ধতি নিয়ে এদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনের বেশিরভাগ সদস্য মনে করত আধুনিকীকরণ, স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্র জনগণের সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব ছিল চরমপন্থা নিয়ে বা সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে। ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত ও বণিক সকলে সমাজতন্ত্র চেয়েছিল। পুঁজিবাদকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এর কারণ হল ইউরোপীয় ও চিনাদের সঙ্গে তা যুক্ত ছিল। পুঁজিবাদকে ইন্দোনেশিয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ি করা হত। ইন্দোনেশিয়ার মানুষের মানসিক গড়নের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ, পশ্চিমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, পারস্পরিকসহযোগিতা ছিল এখানকার জীবনাদর্শ।

সারেকাৎ দাবি করেছিল প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক সংস্কার, ডাচ সরকার এক্ষেত্রে কিছু সংস্কার প্রর্তন করেছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাউন্সিএল ইন্দোনেশীয়দের নেবার ব্যবস্থা হয়, তবে এদের ভূমিকা ছিল উপদেষ্টার। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পিপলস কাউন্সিল গঠন করা হয়, এর অর্ধেক সদস্য ছিল গর্ভনর-জেনারেল মনোনীত, বাকি অর্ধেক নির্বাচন করত স্থানীয় কাউন্সিরগুলি। এদের বেশিরভাগ সদস্য ছিল ডাচ, অন্যরা নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বেশিরভাগ ইন্দোনেশীয়। এজন্য একে প্রতিনিধিত্বমূলক সভা বলা যায় না। এর ভূমিকা ছিল পরামর্শদাতার, আবার গর্ভনর-জেনারেল হেগের অনুমোদন নিয়ে তবে এদের সুপারিশ গ্রহণ করত। এই সংস্কার ইন্দোনেশীয়দের খুশি করতে পারেনি। সারেকাৎ ইসলামের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী ছিল, এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন হেনরিক স্নিভলিয়েট। তিনি পরে ডাচ কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত এই গোষ্ঠীর ইন্দোনেশীয় নেতা ছিলেন সেমাউন ও তান মালাকা। এরা দাবি করেন সারেকাৎ উগ্র বিপ্লবী কর্মসূচি নিয়ে ডাচ শাসন

উচ্ছেদ করবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এদের একটি গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টি[৮] গঠন করেছিল (PKI)। এই দল তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত হয়। সারেকাৎ ইসলামের মধ্যে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। কমিউনিস্টরা প্যান ইসলামকে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক বলে গণ্য করেছিল, উভয়কে শত্রু বলে গণ্য করেছিল। কমিউনিস্টরা সারেকাৎ ইসলামের বৃহত্তর জনসমর্থনকে তাদের আদর্শ প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল। সারেকাৎ বিদেশি পুঁজির বিরোধিতা করেছিল জাতীয় আবেগকে সম্মান দিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি সারেকাতের ধর্ম নির্ভরতাকে পছন্দ করেনি, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভেবেছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ অধিবেশনে সারেকাৎ তার সদস্যদের অন্য সংগঠনে যোগ দিতে নিষেধ করেছিল। এরপর কমিউনিস্টরা সারেকাৎ থেকে বিতাড়িত হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় যুবকদের প্রভাবে সারেকাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গান্ধির অহিংস অসহযোগ নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সারেকাতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে সারেকাতের অনেক তরুণ সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে তান মালাকার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়, এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৫০,০০০, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর এর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। গভর্নর-জেনারেল রক ডাচ সংস্কার প্রবর্তন করে দেয় কর কমিয়ে দেন, আমদানি-রপ্তানি শুল্কও কমানো হয়। সরকার নিম্নপদস্থ অনেক কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছিল, বোনাস দান বন্ধ করেছিল। শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়দের অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ে। ইন্দোনেশীয়দের দেয় করের হার বেড়ে যায়, দেশি ও বিদেশিদের দেয় করে বৈষম্য ছিল। শহুরে কর্মচীদ্দর, শিক্ষিত বেকার ও করভারে জর্জরিত মধ্যবিত্ত সকলে কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছিল। দেশে শিক্ষিত মানুষের হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ, অথচ কমিউনিস্ট কর্মীরা ছিল ৭৬.১ শতাংশ শিক্ষিত। অনেক ইন্দোনেশীয় যুবক ডাচ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেও দশ বছর বেকার বসে ছিল, এদের অনেকে আবার প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী। কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষিত বেকার, মধ্যবিত্ত, তরুণ ও শহুরে শ্রমিকের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে একটি উগ্রপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রেলের ধর্মঘট পরিচালনা করে জাভার অর্থনীতিকে অচল করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সেমাউন, আলিমিন, মাসো ও তান মালাকা ২২টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে গঠন করেন ফেডারেশন। এটা ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত। এর মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিলক্ষিত হত, ধর্মঘট, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন ও বিশোভ মিছিল আয়োজন করা হত। ডাচ সরকার এদের দমন করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল। ফৌজ আইনবিধি সংশোধন করে অর্থনীতিকে অচল করার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকার দমনপীড়ন শুরু করলে বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা আরো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মালাকার আপত্তি অগ্রাহ্য করে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শহরগুলিতে ধর্মঘট হয়, জাভা ও সুমাত্রায় বাগিচা শিল্পে অচলাবস্থা তৈরি হয়। ডাচ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। এই অভ্যুত্থান ব্যাপক আকার নিয়েছিল তবে সীমিত ছিল শহুরে শ্রমিকদের

মধ্যে। এই অভ্যুত্থান ছিল অপরিণত, অবিবেচিত কাজ, ডাচ সরকার এই অভ্যুত্থান দমন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিদের সরকার ভেঙে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়, এর ১৩,০০০ সদস্যকে বৃদ্ধি করে শাস্তি দেওয়া হয়। সেই সময় মনে হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। ডাচ শাসনকালে এই দলের আর পুনরুজ্জীবন ঘটেনি।

ঐতিহাসিকরা কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা মনে করেন দল জনগণের রাজনৈতিক আত্মপরিচয়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। আরো বড়ো কারণ হল আন্তর্জাতিকের তত্ত্ব ও নিয়মবিধি মানেনি। আন্তর্জাতিক সব ঔপনিবেশিক দেশের সাম্যবাদী দলকে সব বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের কথা বলেছিল। কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করতে বলেছিল, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতিকে সম্মান করতে বলেছিল। এভাবে জনগণের আস্থা অর্জন করে গণবিদ্রোহ পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। উগ্রপন্থা, রাজনৈতিক প্রতারণা ও নেতৃত্বের লোভ তাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। সারেকাৎ ইসলামের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়নি। সারেকাৎ ইসলাম থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিচ্ছিন্নতা তার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কমিউনিস্ট পার্টি সারেকাতের নরমপন্থী নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনগণের খুব কাছের লোক ছিল। নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একাংশকে বন্দি করা হয়, এজন্য দ্বিতীয় শ্রেণির নেতারা ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির মানসিকতা ও সংগঠন কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ছিল না। এর নেতৃত্বের বেশিরভাগ ছিল নিম্নবর্গের অভিজাত যারা চিরকাল কৃষক শ্রেণিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নিম্নস্তরের কর্মীরাও ছিল বেশ শিক্ষিত, তারাও কৃষকদের বেশ অবজ্ঞা করত। এই পার্টি দেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে তেমন বিস্তার করতে পারেনি। তাছাড়া কমিউনিস্টরা ধর্মকে জীবনের এক বিশিষ্ট উপাদান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল তা কৃষকদের থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী বিপ্লবের আহ্বান তুললেও গ্রামাঞ্চলে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কৃষক সমাজ তেমনভাবে সাড়া দেয়নি।

কমিউনিস্ট বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে এবং ঔপনিবেশিক সরকার দমনপীড়ন চালালে জাতীয়তাবাদী দল প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনায় তেমন উৎসাহী ছিল না। এর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদীরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিযুক্ত করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল সারেকাৎ ইসলামে যারা স্কুল স্থাপন করেছিল, সমবায় প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের সহজ ঋণের ব্যবস্থা করেছিল। এই সময়কালে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করা হয়। এর নাম তামান শিশ্ব (শিষ্যদের বাগান) যেখানে দেশি ও পশ্চিমি ভাবধারা মিশিয়ে শিক্ষাদান করা হত। এসব কাজকর্ম ছিল অরাজনৈতিক, স্কুলগুলি জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটিয়েছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি করেছিল যারা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে শামিল হয়। এসব ধীর গতির কর্মসূচি অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, বিশেষ করে হল্যান্ড থেকে প্রত্যাগত উচ্চ শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়দের। এদের অনেকে ছিল বামপন্থী, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডে গঠিত ইন্দোনেশীয় ইউনিয়নের সদস্য। এই দলের সদস্য হন ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত এক ইঞ্জিনিয়ার। ইনি হলেন সুকর্ন, ইনি ও দিপ্তো কাসুমি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন (পারসেরিকাতান ন্যাশনাল

ইন্দোনেশিয়া)। অল্পকালের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদী দল, (PNI) দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এই দল সব অকমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার কর্মসূচি নিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি দ্বারা এরা প্রভাবিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল লাল ও সাদা পতাকা গ্রহণ করেছিল। ইন্দোনেশীয় ভাষা ও জাতীয় সংগীত 'ইন্দোনেশিয়া বয়া' (বৃহত্তর ইন্দোনেশিয়া) গ্রহণ করেছিল। এগুলি হল ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠলে ডাচ সরকার একে দমন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সরকার সুকর্ন সহ চারজন নেতাকে বন্দি করেছিল, জাতীয় দল ভেঙে দিয়েছিল, একে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এই দলের দুইজন বিশিষ্ট নেতা মহম্মদ হাত্তা ও সুলতান শাহরির বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এরা দেখলেন দল নেতৃত্বহীন, কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। হাত্তা ও শাহরির একটি গোষ্ঠীতে যোগদেন, এর পরবর্তীকালে নাম হয় ইন্দোনেশিয়া ন্যাশানাল এডুকেশন ক্লাব। এই গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মী গঠনের কাজে মন দিয়েছিল। বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে সুকর্ন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে পারতই ইন্দোনেশিয়া নামে একটি গণ-সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি আবার বন্দি হন, এবার বিদেশে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হাত্তা ও শাহরিরকে নিউগিনিতে বন্দি শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক সরকার উৎপীড়ন চালিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করেছিল। জাপানিদের আগমনের আগে বন্দি তিনজন জাতীয়তাবাদী মুক্তি পাননি। শাহরির তাঁর বন্দি জীবনের নির্যাতন নিয়ে লেখেন 'আউট অব একজাইল (Out of Exile)।

ডাচ সরকার ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের আইনের কিছুটা সংশোধন করে, অল্পকিছু সাংবিধানিক সুবিধা দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নরমপন্থীদের দলে টানার জন্য চেষ্টা হয়, অপরদিকে নিষ্ঠুর জমনপীড়ন চালিয়ে দেশি নেতৃত্ব ও বিদেশি সহযোগিতা ধ্বংস করার চেষ্টা হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের আইনে ভোকরাডের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৮ থেকে ৬০ করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ছিল নির্বাচিত। নির্বাচিত ইন্দোনেশীয়রা ছিল সংখ্যালঘু, শিক্ষিত শহরে জাতীয়তাবাদীরা কাউন্সিলের সদস্য হতে পারেনি কারণ স্থানীয় কাউন্সিল দেশি সদস্যদের নির্বাচিত করেছিল। এই ভোকরাড বা কাউন্সিল শুধু সরকারি নীতির সমালোচনা করার অধিকার পেয়েছিল, তবে শাসন ও আইনসভার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে হল্যান্ডের আইনসভা তা অনুমোদনের অধিকার পেয়েছিল। ভোকরাডের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এই সভা কোনো আইন বাতিল করলে রাজা তা অনুমোদনের অধিকার লাভ করেন। প্রাদেশিক স্তরে অ-ইউরোপীয় সদস্যরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, শুধু জাভার ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য ছিল, অন্য দ্বীপগুলিকে অনগ্রসর ধরে নিয়ে বাদ দেওয়া হয়। অত্যন্ত ধীরগতিতে প্রাদেশিক ধারাগুলি কার্যকর করা হয়।

সরকারের দমননীতির ফলে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট উগ্রপন্থী নেতারা সকলে বন্দি ছিলেন, বা দেশের বাইরে ছিলেন। এজন্য এরা কাউন্সিলে অংশ নিতে পারেনি। নরমপন্তী ভোকরাড বা কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল। এই দাবি উঠেছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, সরকার ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ঐ সময় নির্বাসিত ডাচ সরকার যুদ্ধের পর সম্মেলন ডাকার

প্রস্তাব করেছিল। জাতীয়তাবাদীরা এই প্রস্তাবকে গান্ধির মতো post dated cheque on a crashing bank বলে উল্লেখ করেছিল। ডাচদের গত তিন দশকের নীতি প্রমাণ করেছিল তারা ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। যুদ্ধের পর ডাচরা ফিরে এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

জাপানিরা ইন্দোনেশিয়া জয় করে (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) এই দেশকে স্বাধীনতা দানের উদ্যোগ নেয়নি। জাপানিরা ধরে নিয়েছিল ধর্মীয় কারণে ইন্দোনেশিয়া ডাচ শাসনের বিরোধী ছিল, রাজনৈতিক বিরোধিতা ছিল না। ইন্দোনেশিয়া অধিকারের দশ বছর আগে থেকে জাপান ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আনুগত্য লাভের প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় জাপানি ছাত্র পাঠিয়ে তাদের ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জাভাতে ইসলামি ফেডারেশনের সভায় জাপানি প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিল। যে জাপানি বাহিনী ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করেছিল তাতে মুসলিম সৈন্য রাখা হয়, জাপানি ইসলামি পণ্ডিতরা তাদের সঙ্গে ছিল। ইন্দোনেশিয়া দখল করে জাপান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দেয়, রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে দমন করে। তারা সারেকাৎ ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী দলকে দমন করেছিল। ইসলামিক ফেডারেশন জাপানিদের শ্রমিক সংগ্রহ করে দিত, সৈন্যসংগ্রহে সহায়তা দিত, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত। তবে এক বছরের মধ্যে ইসলামি ফেডারেশনের মোহভঙ্গ হয়, তারা জাপানিদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বুঝেছিল, কো-প্রসপারিটি স্ফিয়ারের অর্থ বুঝেছিল। জাপানিরা তাদের সম্রাট-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাতে বললে ইসলামি ফেডারেশনের সদস্যরা ক্ষুন্ন হয়। মুসলিম ধর্মনীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং ইসলামি শাস্ত্রবিরোধী, জাপানি সৈন্য গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালালে জাপানি শাসন অপ্রিয় হয়ে যায়। এরা স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। ইসলামি ফেডারেশন সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলে জাপানিরা এর বিকল্প সন্ধান করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত মানুষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল, এরা অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। জাপানিরা এদের কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আদায়ের পরিকল্পনা করেছিল। জাপানিরা সুকর্নর কাছে সহযোগিতার আবেদন রেখেছিল, তারা তাঁকে নির্বাসন থেকে মুক্ত করেছিল। একটি রাজনৈতিক সংস্থা পুতেরা (putera) গঠন করা হয় যা ছিল জাপানিদের পুতুল সংগঠন। সুকর্ন তাঁর সহকর্মী হাত্তা, শাহরির ও শরিফুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করে এক গোষ্ঠী সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়। অন্য গোষ্ঠী এর সুযোগ নিয়ে গোপনে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে ঠিক হয়। জাপানি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক বছরের মধ্যে জাপানি কর্তৃপক্ষ পুতেরাকে সন্দেহ করে তুলে দেয়, তবে সুকর্ণ সমর্থন ও হাত্তাকে ব্যবহার করে তারা জনগণের সহযোগিতা পাবার প্রয়াস সরকার প্রধান হিসেবে সুকর্ণ ও হাত্তা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। জাপানিরা খুব কম দিয়েছিল। সুকর্ণর অধীনে ১০০,০০০ সৈন্য সামরিক শিক্ষা পেয়ে বিরদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে এরা ছিল শক্তিশালী হাতিয়ার সুকর্ণ সভা সমিতি গঠনের সুযোগ পান, এসব অধিকার তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজ করেন। জাপানিদের ওপর চাপ দিয়ে তিনি কিছু অধিকার আদায় করেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা গোপনে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

জাপান আত্মসমর্পন করলে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় (১৭ আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)।

জাতীয়তাবাদী নেতারা পঞ্চশীল ঘোষণা করেছিল—জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সম্মতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর বিশ্বাস। জাতীয়তাবাদের অর্থ হল জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সুমাত্রার শেষপ্রান্ত থেকে ইরিয়ান হবে এই জাতি রাষ্ট্রের সীমা। বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিচিত্র ভাষা ও দ্বন্দ্বকে ঐক্যসূত্রে বাঁধা হবে জাতি রাষ্ট্রের আদর্শ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আন্তর্জাতিকতাবাদ একটি জাতিপুঞ্জ গঠন করবে যেখানে প্রত্যেক জাতি অন্যের জাতিসত্তা মেনে নেবে। আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ। সুকর্ন এমন ব্যাখ্যা দেন। গণসম্মতি, প্রতিনিধিত্ব ও আলোচনা হবে জাতিরাাষ্ট্রের ভিত্তি। এসব আদর্স জাতি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে (the principle of consent, he principle of representationd and the principle of consultation)। সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ হল জনগণের সকলের সমৃদ্ধি। পশ্চিমি পুঁজিবাদ সকলের সুখের কথা বলে না, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সকল মানুষের সুখের ব্যবস্থা করা হবে। এখানকার গণতন্ত্র হবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, পশ্চিমের পুঁজিবাদ নির্ভর গণতন্ত্র নয়। প্রাচীনকালের ন্যায়ের দেবতা রাতু আদিলের নাগরিক তার নিজস্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবেন, ধর্মের ক্ষেত্রে সকলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। নেতাদের মধ্যে পঞ্চশীলের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীরা সকলে একে মেনে নেন।

পরাজয় আসন্ন বুঝে জাপানি কর্তৃপক্ষ ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতার দানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সুকর্ন জাপানের হাত থেকে স্বাধীনতা নিতে চাননি কারণ তার দল জাপান বিরোধী ছিল, আর পশ্চিমি শক্তিগুলি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়াকে স্বীকৃতি নাও হতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল। এর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে জাতীয় সরকারকে দেখেছিল যে সরকার জনগণের আনুগত্য লাভ করেছিল। তবে ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে রাজি হয়নি। তারা বাটাভিয়া ঔপনিবেশিক সরকার গঠনের প্রস্তুতি নেয়। ডাচ সরকার ও সুকর্ণর জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরি হয়। ১৯৪৫-৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শেষ পর্ব চলেছিল। এই সময়ে জাতীয়তাবাদী সরকার কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যার কয়েকটির উৎপত্তি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে। সুকর্ন ঘোষিত পঞ্চশীল সকলের কাছে গহণযোগ্য ছিল না, একদল জাপানপন্থীদের সঙ্গে আপসের বিরোধী ছিল। ইসলামি মাসজুমি পার্টি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখেনি। এই তত্ত্বে ঈশ্বরের স্থান ছিল না, আর ভয়ংকর শ্রেণি সংঘর্ষে তত্ত্ব এতে ছিল। তারা ইসলামি সমাজতন্ত্রে আস্থা রেখেছিল বা প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী, উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে আগ্রহী। ইন্দোনেসিয়ার জাতীয়তাবাদী দল (PNI) কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, একটি গোষ্ঠী রক্ষণশীল পারতাই ইন্দোনেসিয়া রাজা দল (PIR) গঠন করেছিল। এরা সীমিত প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছিল, তবে সরকার হবে পিতৃতান্ত্রিক, শিক্ষিত ব্যক্তিরা গ্রামীণ স্বার্থরক্ষা করে নেতৃত্ব দেবে। প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো বিরোধিতা এসেছিল কমিউনিস্টদের কাছ থেকে যারা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্যাবিনেট সদস্যদের অপহরণের পরিকল্পনা করেছিল (জুন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)। দুই বছর পর আবার কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। প্রজাতন্ত্র এই দুই বিদ্রোহ

দমন করেছিল। একই সময়ে সুকর্নর প্রজাতন্ত্র ডাচদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এই বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের যুগে একটিমাত্র শক্তি প্রজাতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল। এই শক্তি হল ইন্দোনেশীয় নাগরিক ডাচ শাসনের প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেছিল। ব্রিটিশ সৈন্য জাভায় প্রবেশ করে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুই লক্ষ বন্দি ওলন্দাজদের মুক্ত করে দিয়েছিল। নতুন ডাচ গভর্নর-জেনারেল ভ্যান মুক বাটাভিয়ায় এসে সুকর্ন সরকারকে জাপানের সহযোগী তাঁবেদার সরকার হিসেবে নিন্দা করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল ব্রিটিশ বাহিনী ডাচদের পুনর্বাসনের জন্য সুকর্ন সরকারের সমর্থন কামনা করেছিল। হল্যান্ড সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নিলে ডাচ স্বার্থ নিয়ে সুকর্ণ আলোচনায় রাজি ছিলেন। ডাচদের মনোভাব বুঝে তিনি সুলতান শাহরিরকে সরকার প্রধান হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। তবে ডাচ সরকার অবশ্যই ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেবে। এই ব্যাপারে কোনো আপস করতে সুকর্ণ রাজি হননি

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রানি উইলহেল মিনা ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে একটি ঘোষণা জারি করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডাচ সরকার তার ভিত্তিতে আলোচনায় রাজি ছিল, জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন সেই প্রস্তাব অর্ধ শতকের পুরোনো। অধ্যাপক হলও সেই ধারণা পোষণ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদ অনেকটা এগিয়ে ছিল। ডাচরা ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। প্রজাতন্ত্রের শক্তি সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল না ইন্দোনেশিয়া এই সময়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, একভাগ ছিল সুকর্ণ প্রজাতন্ত্রের অধীনে, অন্য ভাগ মিত্রশক্তির সহায়তা নিয়ে হল্যান্ড পুনর্দখল করতে শুরু করেছিল। ডাচ ঔপনিবেশিক শাসকরা কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিল, এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কাল হরণ করা। এসময়ের বিবদমান দুই দলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ছিল লিঙ্গফজাতি (২৫ মার্চ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)। জাভার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি সংবিধান সভা আহ্বান করা হবে। হল্যান্ড ও ইন্দোনেসিয়াকে নিয়ে এইটি ইউনিয়ন গঠিত হবে। সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ সব এই ইউনিয়নের হাতে থাকবে। ইউনাইটেড স্টেট অব ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হবে। তবে ডাচদের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। ইন্দোনেসিশার জাতীয়তাবাদীরা এই প্রস্তাব মানতে চায়নি। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। অল্পকাল পরে দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিল।

এই লিঙ্গফজাতি চুক্তির তিন মাসের মধ্যে ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে দেয় যার নাম ছিল পুলিশি ব্যবস্থা। প্রজাতন্ত্রের অধিকৃত অঞ্চলে পুলিশি ব্যবস্থা চালানো হয়। স্তম্ভিত বিশ্ববাসী রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবিত অস্ত্রবিরতি চুক্তি নিরাপত্তা পর্ষদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম ও অস্ট্রেলিয়া দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মসে গণভোটের প্রস্তাব করা হয়। গণভোটের মাধ্যমে ইন্দোনেসিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। ইতিমধ্যে প্রজাতন্ত্র ও ডাচ বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। বিশ্ব জনমত হল্যান্ডের বিপক্ষে চলে যায়, ডাচ সরকার সমালোচিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এশিয়ান

কনফারেন্স আহ্বান করে ডাচদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্গা, মায়নমার, সৌদি আরব ও ইরাক ডাচদের বিমান ও জাহাজের সব সুবিধা বাতিল করেছিল। এশিয়ার দেশগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে ডাচদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন করেছিল। নেহরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এসিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেন। এই অধিবেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র বিরতির নির্দেশ দেয়। এরা বন্দি মুক্তি ও জোগজাকার্তায় প্রজাতন্ত্রী সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল্যান্ড সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে বলেছিল। সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে তুলে দিতে বলেছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা লাভ করে। আজ ইন্দোনেশিয়া গঠিত হবে, এর মধ্যে থাকবে ১৬টি অঙ্গরাজ্য, ডাচ রাজতন্ত্রকে মেনে নেওয়া হবে। স্বাধীনতা লাভ করে সুকর্ন হন যুক্তরাষ্টে প্রেসিডেন্ট হাক্কা প্রধানমন্ত্রী। হল্যান্ডের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। কেন্দ্রীভুত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ইন্দোনেশিয়া হল স্বাধীন, অর্থভৌম এক কেন্দ্রশাসিত যুক্তরাষ্ট্র। এসব বিনা রক্তপাতে অর্জন করা সম্ভব হয়নি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদ জয়ী হয়।

১৬১.৬.৬.৫ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার নেতা সুকর্ণ

১০.১০.১ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ নীতি

১৯৪৫-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সংবিধানের অধীনে সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারে প্রভুত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা ও রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করা সহজ ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনকালে মায়ানমার, ফিলিপিনস ও মালয় প্রতিনীধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। ইন্দোনেশীয়দেরহ সে সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফরাসিদের মতো ডাচরা ঔপনিবেশিক আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছিল যদিও জনসংখ্যায় তারা ছিল ১ শতাংশের কম। ইন্দোনেশিয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়নি। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবার পর প্রথম পর্বে১৯৪৯-৫৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারের স্থিতিশীলতা ছিল না, রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত অস্থির ও অশান্ত ছিল যে এই ছ'বছরে পাঁচটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় এই রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় তাদের জনসমর্থনর যাচাই করে নিতে চেয়েছিল। জাতীয় আইনসভায় সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬৩, এই পদগুলির জন্য ষোলোটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। এই ষোলটি দলে মধ্যে চারটি জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছিল, এদের সকলের বেশ কিছু সদস্য ছিল তবে কোনো দল নিয়ন্ত্রণ গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। সংবিধান সভায় এসব দলের প্রতিনিধিত্ব একই রকম ছিল। জাতীয়তাবাদী PNI ও মাসজুমি প্রত্যেকে ৫৭টি করে আসন পেয়েছিল (২২%) নাদাতুল ইসলাম ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৬

শতাংশ ভোট পেয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে ছিল অর্থনৈতিগক অবনতি, মুদ্রাস্ফীতি ১৯৪৯-৫৫ খ্রীঃ মধ্যে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দ্রব্যমূল্য দু'গুণ হয়ে যায়, শহরে তা আরো বৃদ্ধি পায়। বাগিচা শিল্প পরিত্যক্ত হলে রপ্তানি কমেছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রপ্তানিক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। কালোবাজারি বেড়েছিল। জাতীয় সরকার শিল্প ও বাণিজ্য জাতীয়করণ করতে পারে এই আশঙ্কার বিদেশি পুঁজিপতিরা বিশেষ করে চিনারা লগ্নিতে আগ্রহ দেখায়নি। জাভার উর্বর জমি ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্যের সরবরাহ বজায় রেখেছিল। বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেশে স্থিতিশীল সরকার গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ঠিক এই কারণে জাতীয় রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। এত রাজনৈতিক দলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি উন্নতি করে চলেছিল। এই দল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থক সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছিল। শ্রমিক ইউনিয়ন ও যুবকদের মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শবাদ প্রচার করা হয়। কোনো রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, জনগণ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব কামনা করেছিল। দেশকে শক্তিশালী শাসন দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ১৯৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিজের হাতে অনেক ক্ষমতা তুলে নেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি অবরোধ ও যুদ্ধ তত্ত্ব প্রচার করেন। রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করেন যাতে কৃষক, শ্রমিক, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট ও সামাজিক নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই কাউন্সিলের প্রধান হল সুকর্ন। মুসলিম দল নাদাতুল ইসলাম, মাসজুমি ও জাতীয় নেতা হাত্তা এই কাউন্সিলে ছিল না। সুকর্ন এই গণতন্ত্রের নাম দেন গাইডেড ডেমোক্রেসি, এর ভিত্তি হল সকলের সম্মতি , সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্থগিত রেকে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সুমাত্রায় এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর সুযোগ নিয়ে সুকর্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে দমন করেন, নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। স্থানীয় সামরিক অফিসার ও সরকারি কর্মচারীরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, তারা সুকর্নর বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে অতিরঞ্জিত করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সুকর্ন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানকে পুনঃপ্রবর্তন করেন, এতে প্রেসিডেন্ট অনেক প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পান, আইনসভাকে খুব কম ক্ষমতা দেওয়া হয়। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকায় সুকর্ন আরো অনেক স্বৈরাচারী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে তিনি বেআইনি ঘোষণা করেন। মাসজুমি নিষিদ্ধ হয় কারণ কয়েকজন বিদ্রোহী নেতৃবর্গের সঙ্গে এই দলের যোগ ছিল। তিনি একটি জাতীয়তাবাদী জোট গঠন করেন। তাই জোট তাঁর নীতিগুলিকে সমর্থন করেছিল। তিনি ঘোষণা করেন যে সংসদীয় গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ায় ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়নি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের স্থলে কো-অপারেটিভ পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার পেয়েচিল, তবে কোনো বিষয়ের ওপর ভোট নেবার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রথাগত ইন্দোনেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মতৈক্যের ওপর জোর দেওয়া হয় (মুশাওরা ও গোটং রজং)। এসব পরিবর্তন এনেও প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা যায়নি, জনগণও ভালো প্রশাসন পায়নি। দুর্বল সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থান নিয়েছিল কর্তৃত্ববাদী দায়হীন সরকার।

জাতি গঠন, প্রশাসনিক সংস্কার, জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি এসব কাজে মন না দিয়ে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দিকে মন দেন। এসব কাজ করে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয়। জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে প্রেসিডেন্টের সমর্থন বাড়ানো হয়। সরকার পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, 'মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করো' এই স্লোগান দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়া হল উদীয়মান এশীয় শক্তির প্রতীক। ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী জাকার্তাকে নতুন করে সাজানো হয়। দেশের ঋণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, মুদ্রাস্ফীতি সীমা ছাড়িয়েছিল, উৎপাদন ও রপ্তানি কমেছিল। শাসন ও সামরিক বাহিনীতে প্রচণ্ড দুর্নীতি দেখা দেয়। লাইসেন্স, পুলিশ ও কর বিভাগের দুর্নীতি বেশি ছিল। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা প্রচুর উৎকোচ নিত। জাভার জমি এত উর্বর ছিল যে কৃষকের জীবনধারণে কোনো অসুবিধা হয়নি। শহর অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ মিলিয়ন, চিনের বাইরে কোনো এশীয় দেশে এত কমিউনিস্ট সদস্য ছিল না। এদের চাপে সুকর্ন অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হন।

১০.১০.২ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার বিদেশনীতি

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে বৈদেসিক সম্পর্ক গুরুত্ব পেয়েছিল। এই বৈদেশিক সম্পর্ক ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই দুই রাজনীতির পারস্পরিক টানাপোড়েন ঘটনা প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল যার পরিণতিতে সুকর্ন ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম দশ বছরে সুকর্ন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আদর্শ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। মায়ানমারের উ-নু এই ধরেছিলেন। সরকারি ভাবে পর রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হিসেবে বলা হয় 'সক্রিয়, স্বাধীননীতি যার উদ্দেশ্য হল শান্তি রক্ষা করা করে চলা। দুই মহাশক্তিধর শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রত্যেকটি আর্ন্তজাতিক ঘটনায় গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ইন্দোনেশিয়ার নীতি। যেসব দেশ উপনিবেশবাদ বিরোধী ছিল ইন্দোনেশিয়া তাদের নেতৃত্বের আসনে বসেছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব দেশ তখনো ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিল তাদের মুক্তি সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়া নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিল। এরকম নীতি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলম্বো শক্তিসমূহ ডাচ নিউগিনিতে (পশ্চিম ইব্রিয়ান) ইন্দোনেশিয়ার দাবি সমর্থন করেছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন । এতে ইন্দোনেশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি ঘটে, ২৯টি আফ্রো-এশীয় দেশের প্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হন।

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠা থেকে সুকর্ন গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন যদিও চিন জোটনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেয়নি। নেহরু, উ-নু, সুকর্ন ও হাত্তাকে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক বা লেজুড় বলে উল্লেখ করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার নেতারা মনে করেন অনেকখানি দূরত্ব হেতু চিন তার পক্ষে বিপজ্জনক নয়। চিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করলে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) নেহরু ও সুকর্ন বান্দুং সম্মেলনে উৎসাহের সঙ্গে চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। চিন তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ

করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার চিনাদের অবস্থান নির্ধারণের জন্য তিনি চিনের সঙ্গে দ্বৈত নাগরিকত্ব চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। ইন্দোনেশিয়ার এই সময় প্রায় ১৫ লক্ষ চিনা বাস করত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা ছিল প্রভাবশালী। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরফলে দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অনেক ইন্দোনেশীয় চিনা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল। চিনা নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিল। বান্দুং সম্মেলন সুকর্ণর উচ্চাশা জাগিয়ে তুলেছিল, তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় পদক্ষেপ নেবার উদ্যোগ শুরু করে দেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি অনমনীয় অবস্থান নেন, অনেকগুলি জটিল দাবি তুলেছিলেন, উদ্ধত ছিল তাঁর ভঙ্গি, পশ্চিমি নেতা ও তাদের অনুগামীদের তিনি নিন্দা করেন। সুকর্ন পশ্চিম ইরিয়ানে ডাচ শাসনের অবসান দাবি করেন। তবে যেভাবে তিনি আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেন তা কলম্বো শক্তিবর্গকে আতঙ্কিত করেছিল। তাঁরা তাঁকে নরমপন্থা অনুসরণ করতে বলেন। হল্যান্ডের সরকার অনমনীয় মনোভাব নিলে সুকর্নর মনোভাব পালটে যায়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার সময় পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যাটির সমাধান করা হয়নি। ডাচ সরকার এই অঞ্চলে ইউরেশিয়ানদের জন্য একটি বাসস্থান গড়ায় প্রকল্প নিয়েছিল। এখানকার পাপুয়া অধিবাসীরা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি। ইন্দোনেশীয়দের যুক্তি হল ডাচ পূর্ব সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত এই পশ্চিম ইরিয়ান (নিউগিনি) ইন্দোনেশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ইন্দোনেশিয়া-ডাচ কমিশন নিউগিনি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন পেশ করেছিল।

পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে ইন্দোনেশীয় সরকার রাষ্ট্রসংঘকে পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে মধ্যস্থ্যতা করতে বলেছিল, কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে ইন্দোনেশিয়ার সরকার একতরফা ভাবে ইন্দোনেশিয়া-নেদারল্যান্ড ইউনিয়ন ভেঙে দেয়, বিভিনান অর্থনৈতিক দায় অস্বীকার করেছিল। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ডাচ বিরোধী প্রচার চালানো হয়। দেশ থেকে ডাচ বিমান সংস্থার অফিস (KLM) বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখান থেকে হল্যান্ডে অর্থ পাঠানো নিষিদ্ধ হয়। ডাচ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ডাচ মিশনের সব অকূটনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়া ও ডাচদের এই বিরোধ পর্বে ডাচরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সমর্থন পেয়েছিল। দুটি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। প্রথম কারণ হল হল্যান্ড ছিল NATO-র সদস্য, আর দ্বিতীয় কারণ হল সেক্রেটারি অব স্টেট জন ফস্টার ডালেস ইন্দোনেশিয়া সহ নিরপেক্ষ দেশগুলির নির্জোট আন্দোলন পছন্দ করেননি। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশের সমর্থন পেয়েছিল, এদের বেশিরভাগ ছিল রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন ইন্দোনেশিয়াকে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ডাচদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সংঘর্ষ হয়, ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য পশ্চিম ইরিয়ানে প্রবেশ করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ থাস্ট এই বিরোধে হস্তক্ষেপ করেন। থাস্ট ও বাঙ্কার এই বিরোধে মধ্যস্থতা করেন। এই মধ্যস্থতার ফলে রাষ্ট্রসংঘ পশ্চিম ইরিয়ানের শাসন ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। এরপর ইন্দোনেশিয়ার হাতে এর শাসনভার তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তারা গণভোটের মাধ্যমে এখানকার জনগণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ

করতে পারবেন। পশ্চিম ইরিয়ান (নিউগিনি) সমস্যার সমাধান করে সুকর্ন আরো উচ্চাকাঙ্খী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর মনোভাব ছিল নরমপন্থী, পরে তিনি কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের বিরোধিতা করেছিল। ১৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রুনিতে (ব্রুনাই) গেরিলা যুদ্ধ শুরু স্থলে ইন্দোনেশিয়া কমিউনিষ্ঠ পার্টি 'সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এর নেতৃত্ব দেন আজাহারি, এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল সারওয়াক ও সাবার ওপর। আজাহারি ফিলিপিনসের কাছ থেকে কিছু গোপন সমর্থন পেয়েছিলেন কারণ সাবা নিয়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি কেন আজাহারিকে সমর্থন করেছিল, আর মালয়েশিয়ার বিরোধিতায় নেমেছিল যথেষ্ট স্পষ্ট হয়। সম্ভবত মালয়েশিয়া সংকটের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ বোর্নিওতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ইচ্ছা তার ছিল। এই দল আশা করেছিল তার কর্মীরা বোর্নিওতে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেবে। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আজাহারি পরিচালিত আন্দোলন ব্যর্থতায় শেষ হয়, কমিউনিস্ট দল ছিল হতাশ। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন তীব্রভাবে মালয়েশিয়াকে আক্রমণ করে একে ধ্বংস করার আহ্বান জানান (Crush Malayasia)। সুকর্ন মনে করেন মালয়েশিয়া পরিকল্পনা হল ব্রিটিশের তৈরি, টিন, রাবার ও ব্রুনাই-এর তেলের ওপর অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা। তিনি এর নাম দেন নব-উপনিবেশবাদ, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির নয়া কৌশল। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তি নতুন সদ্যোজাত স্বাধীন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। মালয়েশিয়া বিরোধী এই ইন্দোনেশীয় রাজনীতিতে তিন পক্ষ হল সুকর্ন, কমিউনিস্ট পার্টি ও সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনী ধরে নিয়েছিল সিঙ্গাপুরের পিকিংপন্থীরা মালয়েশিয়া ফেডারেশনের ওপর আধিপত্য করবে। এরফলে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশী দেশে চিনের প্রভাব বাড়বে। মধ্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার গেরিলারা সারওয়াক ও উত্তর বোর্নিও অঞ্চলে প্রবেশ করে মালয় উপকূলে আঘাত হেনেছিল। মালয়েশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করা যায়নি, কালোবাজারি চলেছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া, ফেডারেশন ত্যাগ করে স্বাধীন হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনী মনে করে অভিযানের আর প্রয়োজন নেই কারণ সিঙ্গাপুর ফেডারেশন যোগ করায় এই অঞ্চলে চিনের প্রভাব কমবে। ইন্দোনেশিয়ায় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আরম্ভ হলে মালয়েশিয়াকে বাধাদানের নীতি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ শুরু হলে মালয়েশিয়ার বন্ধু অনেকগুলি আফ্রো-এশীয়া দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। এরা মনে করে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের পেছনে কোনো ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র নেই। পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে ইন্দোনেশিয়া এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে নিয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই উদ্যোগে সুকর্ন ঘানার পেরিসিডেন্ট নক্রুমা ও কাম্বোডিয়ার সিংহানুকের সমর্থন লাভ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সুকর্নর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সুকর্ন মালয়েশিয়াকে বলেছিল নব উপনিবেশবাদের এজেন্ট, পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। এসব ধারণা সুকর্নর অনেক বন্ধুদেশ গ্রহনণ করেনি,

বিশেষ করে নির্জোট আন্দোলনের নেতারা এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়নি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নির্জোট আন্দোলনের বেলগ্রেড অধিবেশনে নেহরু সুকর্নর বিরোধিতা করেন, তাঁর বক্তব্যকে বাতিল করে দেন। তিনি বলেন উপনিবেশবাদ এখন মৃত। এই সময়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশীরা সুকর্নর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ইন্দোনেসিয়ার সৈন্যবাহিনী উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়েছিল। প্রথমে তিনি পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হন, পরে মালয়েশিয়ার বিরোধিতায় নামেন। এর পর কোন্ দেশ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার হবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুকর্ন জনপ্রিয় ছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না কারণ তিনি যেসব বক্তৃতা দেন সেগুলি প্রতিবেশীদের কাছে ছিল খুবই উদ্বেগজনক। মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করার প্রকল্প এই অঞ্চলের মানুষ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। মালয়েশিয়া প্রশ্নে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, কোনো দেশ তার জন্য অশ্রুপাত করেনি। মধ্য ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার ভাবমূর্তি যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল না, অকমিউনিস্ট বিশ্বে তিনি ও তার দেশ ছিল নিঃসঙ্গ।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে ইন্দোনেশিয়া ক্রমশ কমিউনিস্ট দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিতে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সফরে গিয়ে পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে সমর্থন আদায় করেন, মালয়েশিয়াকে নব-উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবে তিনি তার তত্ত্বকে উপস্থাপন করেন। পশ্চিমি শক্তিগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি হয়নি। মস্কো তাকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে রাজি হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া তাকে সহজশর্তে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে রাজি হয়, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রাশিয়া তাকে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। রাশিয়া ওডেসাতে ইন্দোনেশীয় নাবিকদের নৌশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। অ্যাম্রনে একটি প্রযুক্তি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল রাশিয়া, সারাদেশে কয়েকটি আর্থিক প্রকল্প করা হয়। রাশিয়া পরিকল্পিতভাবে এখান থেকে পশ্চিম প্রভাব দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিল চিনের প্রভাব থেকে সবচেয়ে জনবহুল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিকে দূরে রাখার চেষ্টা ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া সরকারিভাবে সাহায্য নিয়েছিল, অপরদিকে চিন গোপনে কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য পাঠাত গোপনে চিন অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল। চিনা বণিকদের মাধ্যমে চিন কমিউনিস্টদের অর্থ পাঠাত। কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি অইডিট মস্কো-পিকিং দ্বন্দ্বে কোনো পক্ষ নেননি, দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নেতৃত্ব নিরপেক্ষ থাকার আবেদন জানালেও বেশিরভাগ কর্মী পিকিং-এর দিকে ঝুঁকেছিল, কারণ চিন হল এশীয় দেশ, দ্বিতীয়ত চিন মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বকে সমর্থন করেছিল। ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট নেতা লুকমান রাশিয়াকে সংশোধনবাদী আখ্যা দেন, এরা প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর,.। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর চিনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক।

১৯৫০-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুকর্ন ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে মধ্যপন্থীদের নেতা, কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বামপন্থী, সৈন্যবাহিনী দক্ষিণপন্থী। সুকর্ন সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকলে সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা আতঙ্কিত বোধ করেন। এসব সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করেনি কারণ তারা প্রবাদপ্রতিম নেতা সুকর্নর জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়েছিল। তিনি গণবিমোহিনী শক্তির অধিকারী ছিলেন,

এই বাগ্মী নেতা জনতাকে মুহূর্তে প্রভাবিত করতে পারতেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্টরা সৈন্যবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে এই আশঙ্কা করে সুকর্নর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ৬ জন সেনানায়ককে বন্দি করে, পরে বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। সুকর্ন সম্ভবত এই কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল সুকর্নর নির্দেশে তারা একাজ করেছেন। সুকর্ন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করেন। জেনারেল নাগুতিয়ন পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন, আর জেনালে সুহার্তো নিরপেক্ষ ছিলেন বলে তাকে বন্দি করা হয়নি। এই সুহার্তো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে ক্ষমতা দখল করেন, সুকর্ন ক্ষমতাচ্যুত হন। দেশে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিশাল হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, প্রায় ৫ লক্ষ কমিউনিস্ট নিহত হয়। এদের অনেকে ছিল ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী চিনা। হাজার হাজার কমিউনিস্টকে বন্দি করে রাখা হয়। অনেকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষকে তাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করার সুযোগ বলে গণ্য করেছিল। চিনারা যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে ধনী হয়ে উঠেছিল, ইন্দোনেশীয়রা ছিল দরিদ্র। এই বৈষম্য চিনা বিদ্বেষের এক কারণ হয়। কমিউনিষ্ট নেতা অইডিট, লুকমান ও নজোতো নিহত হন। অতি সহজে সৈন্যবাহিন কমিউনিস্টদের দমন করেছিল, বাস্তবে এর তেমন শক্তি ছিল না। পশ্চিমি শক্তিবর্গ ধরে নিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করবে।

সেনাপতি নাগুতিয়ন ও সুহার্তোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সুকর্ন মালয়েশিয়া বিরোধিতার ডাক দিয়ে ক্ষমতা ফিরে পাবার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সুকর্ন নাগুতিয়নকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি মালয়েশিয়া বিরোধী আন্দোলন জোরদার করেননি। সুকর্ন কয়েকজন কমিউনিস্টকে নিয়ে এক নতুন ক্যাবিনেট গঠন করেন। সমগ্র জাতি ও ছাত্রসমাজ এর বিরোধিতা করেছিল, এর সুযোগ নিয়ে সুহার্তো সুকর্ন ও তার বামপন্থী সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সুকর্নর বিদেশ মন্ত্রী সুবানদ্রিও সহ পনেরোজন মন্ত্রী বন্দি হন। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। জুন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভিশনাল কনসালটেটিভ পিপলস কংগ্রেস সুকর্নকে কার্যত পদচ্যুত করেছিল। সুহার্তো সব শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। সুকর্ন তখনো এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে সুকর্ন অপসারণের কাজ শেষ হয়। তাকে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

১৬১.৬.৬.৬ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) What was the impact of Dutch culture system in Indonesian Agriculture?

২) Write about the rise of nationalism in Indonesia.

৩) Ctitically annalyse the role of Sukarna in Independent Indonesia.